

মিতাভ

ইন্দিরা দেবী



অমিতাভ

ইন্দিরা দেবী

॥ প্রথম প্রকাশ। বুদ্ধপূর্ণিমা। ১৩৬৩ ॥

॥ দাম। এক টাকা চারি আনা ॥

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীসুকুমার চৌধুরী কর্তৃক ৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড, বাণী-শ্রী প্রেস কলিকাতা হইতে মুদ্রিত

"ওই নামে একদিন ধন্য হল দেশে দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ আবরণ
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি॥"

—রবীন্দ্রনাথ

স্কুলের নীচু ক্লাস থেকেই আমাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বুদ্ধের পরিচয় ঘটে। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় বুদ্ধের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাতে তাদের কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয় না বরং বেড়ে যায়। বড়রা বুদ্ধদেবকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে সহজেই মেনে নেবেন। কিন্তু এই মহামানব সম্বন্ধে তাঁদের জ্ঞানও সীমাবদ্ধ। এর কারণ বুদ্ধদেবের জীবনী সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থের অভাব। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের জানবার আগ্রহ যত বেশী সেই আগ্রহ মেটাবার উপকরণ তত বেশী নয়। বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বন করে প্রাচীন পালি ও সিংহলী সাহিত্যে বহু অলৌকিক কাহিনী স্থান পেয়েছে। সেইসব কাহিনীর অলৌকিকত্ব বর্জন করে প্রামাণিক তথ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কিশোরদের উপযোগী বুদ্ধজীবনী রচনার প্রয়াস করেছি। যে সব পাশ্চাত্য ও ভারতীয় মনীষি দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণার ফলে এই মহাপুরুষের জীবন ও চিন্তাধারার উপর আলোকপাত করেছেন, তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ চিত্তে আমার ঋণ স্বীকার করছি। আমার কিশোর বন্ধুরা যদি এই বই পড়ে বুদ্ধদেব সম্পর্কে তাদের কৌতূহল কতকটা পরিতৃপ্ত করতে পারে তাহলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

কলিকাতা
বুদ্ধ পূর্ণিমা
১৩৬৩

ইন্দিরা দেবী

শ্রীমানিক দাস
শ্রীসুরুচি দাস
করকমলেষু।

অমিতাভ

নেপালের তরাই অঞ্চল। চারিদিক ঘিরে ছোট বড় ধূসর পাহাড়ের সারি। উত্তরে আকাশ ছোঁয়া হিমালয়। তারই তলায় দিগন্ত জুড়ে উন্মুক্ত শ্যামল প্রান্তর। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে রাপ্তী, রোহিণী আর গণ্ডকীর জলধারা। তার স্পর্শে পাহাড়ের রুক্ষ পরিবেশ কেটে গিয়ে জেগে উঠেছে সবুজ বনানী, শাল পিয়ালের ঘন বন, ঢেউ খেলানো ধান, ভুট্টা ও যবের ক্ষেত।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের একধারে অরণ্যাকীর্ণ এই স্থান সন্ধান করলে দেখা যাবে একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। পরম সমারোহে আর গভীর শ্রদ্ধায় এই স্তূপটি নিবেদন করেছিলেন সম্রাট অশোক। ভগবান বুদ্ধের পুণ্য জন্মস্থান নির্দ্দেশ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কপিলবাস্তুর লুম্বিনী উদ্যানের যে অংশে ভগবান বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সেই পুণ্যস্থানে আজ থেকে দু'হাজার বছর আগে নির্ম্মিত হয়েছিল এই স্তূপ। ইঁট পাথরে গড়া এই স্তূপের আজ ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তবু যাঁর আবির্ভাব মুহূর্ত্তটি স্মরণ করে এই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়েছিল সেই মহামানবের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে দেশ দেশান্তরের মানুষের কাছে।

মানুষের ইতিহাস রচিত হয়েছে কত বিচিত্র কাহিনীর সমন্বয়ে, কত রাজবংশের উত্থান পতন, জয় পরাজয়, কত সামাজিক বিপ্লব, অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন, কত যুদ্ধ বিগ্রহ চিত্র-বিচিত্রিত করেছে ইতিহাসের পৃষ্ঠা। কত দিগ্বিজয়ী বীরের অভিযানের ফলে পৃথিবীর বুকে বার বার নেমে এসেছে মহাপ্রলয়ের ধ্বংস লীলা, হিংসার তাণ্ডবে বার বার ধরণীর শ্যামল প্রান্তর হয়ে উঠেছে রক্তরঞ্জিত। তবু এই ধ্বংসের যজ্ঞানল থেকেই বার বার আত্মপ্রকাশ করেছে

মহাজীবনের সঞ্জীবনী দীপ্তি, মৃত্যুর আবরণ ভেদ করে দেখা দিয়েছে নবজীবনের স্পন্দন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে একদিন কপিলবাস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে যে মানব শিশু আবির্ভূত হয়েছিল, তার আবির্ভাব মুহূর্ত্তটি পৃথিবীর মানুষের কাছে বহন করে এনেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী, অমৃত লোকের সন্ধান। তাই তার আবির্ভাব মুহূর্ত্তটি শাশ্বত হয়ে আছে মানুষের মনে।

রাজ্যটির নাম কপিলবাস্তু। এমন কিছু বড় রাজ্য নয়, রাজারাও এখানে পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করতেন না। প্রজারা যাঁকে রাজা নির্ব্বাচিত করতো তাঁর উপরই শাসনভার থাকতো। এমনি নির্ব্বাচিত রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন।

রাজ্যটি ছোট হলে কি হবে, তখনকার যুগে এই রাজ্যে যারা বাস করতো তাদের খুব নাম ডাক ছিল আর এরা শাক্য নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে এই শাক্যদের শৌর্য্য বীর্য্যের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। শাক্যরা জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিল। শুদ্ধোদনের সঙ্গে প্রজাদের খুব সম্প্রীতি ছিল। প্রজারা রাজার সুখের জন্য সব কিছুই করতে পারতো। রাজাও প্রজাদের মঙ্গলের জন্য সব সময় সচেতন থাকতেন। তাই পরম সুখে ও নিশ্চিন্তে দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু কাজকর্ম্মের অবসরে যখন তিনি একাকী থাকতেন তখন একটা চিন্তা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে থাকতো, সেটা হলো তাঁর একটিও সন্তান সন্ততি নেই—বংশ রক্ষা হবে কি করে? রাণী মায়াদেবীরও ঐ চিন্তা—একটি সন্তান যদি না হয় তাহলে শ্বশুরকুলের নাম থাকবে কি করে? সুখের বিষয়—বেশীদিন তাঁদের এই দুর্ভাবনা ভাবতে হলো না।

একদিন রাত্রে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখলেন একটি শ্বেত হস্তীর

জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। রাজার কাছে স্বপ্নের কথা বলায় রাজা জ্যোতিষীদের কাছে স্বপ্নফল জানতে চাইলেন। তাঁরা গণনা করে বল্লেন ঃ রাণী শীঘ্রই পুত্র লাভ করবেন এবং সে পুত্র মহাপুরুষ বলে খ্যাত হবেন।

জ্যোতিষীদের কথা শুনে রাজারাণী দু'জনেই খুব খুশী হলেন এবং সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

কপিলবাস্তুর উপকণ্ঠে লুম্বিনী নামে এক মনোরম উদ্যান ছিল। এই উদ্যানটি রাজা আর রাণীর বড় প্রিয় ছিল। অবসর পেলেই তাঁরা এই উদ্যানে বেড়াতে যেতেন। এক শুভদিনে, এক বৈশাখী



পূর্ণিমার পুণ্য মুহূর্ত্তে মায়াদেবীর একটি সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হলো। সারা রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে গেল।

বৌদ্ধ সাহিত্যে বলা হয়েছে বুদ্ধদেবের জন্ম সময়টিতে স্বর্গের দেবতারা উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বেজে উঠলো আর মর্ত্ত্যে হলো পুষ্পবৃষ্টি।

রাজ্যের সকলেই আনন্দ পেয়েছে কিন্তু পরম আনন্দলাভ করলেন রাজা শুদ্ধোদন। তাঁর সকল রকম মনের ইচ্ছা ও বাসনা পূর্ণ হয়েছে তাই তিনি নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন সর্ব্বার্থ সিদ্ধি বা সিদ্ধার্থ। গৌতমকুলে জন্ম হয়েছিল বলে আর একটি নাম হলো গৌতম। আর শাক্য বংশে জন্মেছিলেন বলে রাজকুমারের আর একটি নাম হলো শাক্যসিংহ।

কিন্তু সারা রাজ্যে এই আনন্দের স্রোতের মাঝে হঠাৎ একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেল। শিশুটি যখন মাত্র সাত দিনের তখন হঠাৎ মায়াদেবী দেহত্যাগ করলেন! এত আনন্দের মাঝে বিষাদের ছায়া নেমে এলো! কিন্তু কি করা যাবে—কোনো উপায় নেই। এবার নবজাতকের প্রতিপালনের ভার পড়লো বিমাতা মহা-প্রজাবতীর উপর। ইনি ছিলেন মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগ্নী। কাজেই তিনি আপন সন্তানের মত মাতৃহারা শিশুকে পালনের দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন, পরম যত্নে ও আদরে নবশিশুর রক্ষণাবেক্ষণ করতে লাগলেন। দাসদাসীর উপর কখনও নির্ভর করতেন না, নিজের হাতে শিশুর আহার পরিচর্য্যা বেশভূষা সব কিছুই করতেন। এইভাবে আন্তরিক স্নেহে যত্নে শিশু বড় হতে লাগলো। মায়ের অভাব সে কোনদিনও বুঝতে পারলো না এবং মহাপ্রজাবতীকেই নিজের মা মনে করে তাঁর কাছেই বড় হতে লাগলো। শুদ্ধোদনও অবশ্য রাজকার্য্যের ফাঁকে ফাঁকে এসে ছেলের খবরাখবর নিতেন। শিশুর প্রতি মহাপ্রজাবতীর আন্তরিক যত্ন দেখে তিনি নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

শিশু ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠলো এবং তখন তার বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলো। পাঁচ বছর বয়স হওয়ামাত্র সুরু হলো শিক্ষা দীক্ষার পালা।

সিদ্ধার্থকে গুরুগৃহে পাঠাবার আগে অসিত নামে এক তপস্বী কপিলবাস্তুতে বেড়াতে এসেছিলেন। সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে এঁর খুব

খ্যাতি ছিল, তাই রাজা শুদ্ধোদন এঁকে রাজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং পরে পুত্রের জন্য এঁর কাছে আশীর্ব্বাদ চাইলেন। তিনি সিদ্ধার্থকে দেখে বল্লেন ঃ এই পুত্র সর্ব্বসুলক্ষণ যুক্ত। আর ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন যে এই পুত্র যদি সংসারী হয় তাহলে রাজচক্রবর্ত্তী হবে আর যদি সংসার ত্যাগ করে তাহলে মহাজ্ঞানী সাধক বলে খ্যাতিলাভ করবে। এই তপস্বীর কথা শুনে শুদ্ধোদন খুসী হবেন কি দুঃখ বোধ করবেন তা ভেবে পেলেন না। এতদিন আশা করে যে সন্তান লাভ করেছেন যদি সে সংসার ছেড়ে চলে যায় সেটা কি করে তিনি সহ্য করবেন তা ভেবে উঠতে পাচ্ছিলেন না। সকলেই চায় সন্তান সবদিক দিয়ে বড় হবে—কত আশা আকাজ্ক্ষা মনে হয়—শুদ্ধোদনেরও তাই হয়েছিল।

তারপর গুরুগৃহে সিদ্ধার্থের শিক্ষা আরম্ভ হলো। তখনকার দিনে অভিজাত বংশের ছেলেরা যে রকম শিক্ষা পেতো সিদ্ধার্থকেও সেই রকম শিক্ষা দেওয়া হলো। ব্যাকরণ থেকে সুরু করে বেদ, বেদান্ত, ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস, ভূগোল কিছুই বাদ গেল না। লেখা-পড়ায় তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর সমবয়সীরা তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত হতো। শুধু পাঠ্যপুস্তকই শিক্ষা করেননি, —ক্ষত্রিয়ের ছেলে, তাই অল্প বয়স থেকে অস্ত্রবিদ্যাও শিক্ষালাভ করতে হয়েছিল। বিশেষ করে ধনুর্বিদ্যায় তিনি অল্প বয়সেই অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। লেখাপড়া ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার অবসরে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলো করতে হতো। তখন তাঁর যা বয়স তাতে খেলাধূলো খুব প্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু তা তাঁর সব সময় ভালো লাগতো না। অনেক সময় তিনি খেলাধূলো ছেড়ে আপন মনে কি যেন ভাবতেন।

কোনও দিন সঙ্গীদের নিয়ে রাজধানীর বাইরে বেড়াতে গেছেন, একটু দূরেই পাহাড়, তার তলায় দেবদারু ও পাইন গাছের ছায়ায় ছেলেরা খেলতে সুরু করেছে, সিদ্ধার্থও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন

আর খেলাও খুব জমে উঠেছে। বালকদের কলকণ্ঠে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠেছে কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল সিদ্ধার্থ সেখানে নেই। সঙ্গীরাও বলতে পারে না যে রাজকুমার কোথায় গেছেন। সঙ্গে পরিচারক যারা ছিল তখন তারা খুঁজতে বার হলো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল বনের এক নির্জ্জন জায়গায় একটা গাছের তলায় নিবিষ্ট চিত্তে বসে আছেন। সঙ্গীদের ডাকাডাকিতেও সাড়া পাওয়া গেল না, এতই নিবিষ্ট চিত্ত! যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হলো। এমনি ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। কোনোদিন এমনও হয়েছে যে খেলতে বেরিয়ে কিছুক্ষণ বাদে এক নির্জ্জন জায়গায় বসে থাকতেন—সে যে কতক্ষণ বসে আছেন তার কোন হিসেব নেই। সঙ্গীরা খেলা শেষ করে বাড়ী ফিরে গেছে, পাহাড়ের মাথা থেকে সূর্য্য কখন অস্ত গেছে, অন্ধকার নামতে আর দেরী নেই—তখন ধীরে ধীরে সেই নিঃসঙ্গ স্থান ছেড়ে সিদ্ধার্থ বাড়ী ফিরে আসতেন। তাঁর হাব-ভাব, চাল-চলন দেখে শুদ্ধোদনের অনেক সময় ভাবনা হতো।

গুরুগৃহে পাঠ সমাপ্ত হবার পর সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। শুদ্ধোদন আর মহাপ্রজাবতী দু'জনেরই আন্তরিক ইচ্ছা যে এবার একটি সুলক্ষণা কন্যার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দেবেন। চারিদিকে তারই অন্বেষণ চলতে লাগলো। তারপর একদিন মহাসমারোহে দণ্ডপাণি শাক্যের কন্যা গোপা বা যশোধারার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। যেমন সৌম্যদর্শন সিদ্ধার্থ,—তেমনি সুন্দরী গোপা। সকলেই নব দম্পতীকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করলেন। শুদ্ধোদনের আজ আনন্দ ধরে না। এত আনন্দের মাঝে তার মায়াদেবীর কথা মনে পড়লো। তিনি বেঁচে থাকলে পুত্র ও পুত্রবধূ দেখে কত সুখী হতেন!

শুদ্ধোদন ভেবেছিলেন যে ছেলে বিবাহ করে সংসারের প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠবে, সিদ্ধার্থের যে আনমনা ভাবটা ছিল ক্রমশঃ

কেটে যাবে। পুঁথিগত বিদ্যা এবার শেষ হয়েছে তাই শুদ্ধোদন মনে করলেন নিজে তিনি সিদ্ধার্থকে রাজকার্য্য পরিচালনা শেখাবেন। রাজসভার কাজ সেরে আবার সিদ্ধার্থকে নিয়ে তিনি প্রায়ই বেড়াতে বেরোতেন তাঁর জমিজমা দেখাশুনা করার জন্য। (তাঁর নিজস্ব অনেক জমিজমা ছিল আর ফসল হতো খুব বেশী তাই তাঁর নাম হয়েছে শুদ্ধোদন।) এই রকম একবার শুদ্ধোদন ছেলেকে সঙ্গে করে জমির তত্ত্বাবধান করে বেড়াচ্ছেন। কোন জমিতে কি চাষ করলে ভালো হয়, কোন জমিতে কতখানি ধান পাওয়া সম্ভব এইসব খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত—এমন সময় সিদ্ধার্থ কিছু না বলে কয়ে সেখান থেকে চলে গেছেন। শুদ্ধোদন যখন ছেলের অনুপস্থিতির কথা জানতে পারলেন তখন তার কথামত তাঁর অনুচরেরা যুবরাজকে খুঁজতে বার হলেন। তারপর কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর গ্রামান্তরে এক নির্জ্জন প্রান্তে সিদ্ধার্থকে দেখা গেল এক বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট। অনেক ডাকাডাকি করেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। তাঁর ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি আর মুদ্রিত চক্ষুর দিকে তাকিয়ে শুদ্ধোদনের ইচ্ছা হলো না তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে। তিনি অপেক্ষা করে রইলেন। কিছুক্ষণ পর সিদ্ধার্থের চক্ষু উন্মীলিত হলো। ধ্যানলোক থেকে তিনি ফিরে এলেন বাস্তব অনুভূতিতে। শুদ্ধোদন তাঁকে নিয়ে এলেন। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শুদ্ধোদন রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

শুদ্ধোদন সব সময়েই জ্যোতিষীর কথা ভাবতেন। তিনি বলেছিলেন যে এই সন্তান যদি জরা-মৃত্যু-শোক এই সবের কোনো দৃশ্য দেখতে পান তাহলে তাঁর মনে যে অনুভূতি জাগবে তাতে তাঁকে আর সংসারাশ্রমে আটকে রাখা যাবে না। এই কথা মনে হতো বলে যতদূর সেই সম্বন্ধে সাবধান করা যায় তা শুদ্ধোদন করেছিলেন। যখন তখন যার তার সঙ্গে তাঁকে যেতে দেওয়া হতো না এবং যাতে তাঁর মন সংসারে আকৃষ্ট হয় সেইজন্য নানা বিলাসের

ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ঋতুতে বাস করবার জন্য শুদ্ধোদন সিদ্ধার্থকে তিনটি প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছিলেন, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত —এই তিন ঋতুর জন্য তিনটি প্রাসাদ এবং তাতে বিলাসের প্রভূত উপকরণের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রাসাদের সামনে সুন্দর ফুলের বাগান, ফলের গাছ, সরোবর ইত্যাদি। এমনভাবে ভোগ-বিলাসের আয়োজন করা হয়েছিল যে তাঁকে প্রাসাদের বাইরে বড় একটা আসতে হতো না। শুদ্ধোদনের ব্যবস্থায় বন্ধুবান্ধবেরও অভাব ছিল না। তবু ক্ষত্রিয়ের ছেলে—সব সময় প্রাসাদে আবদ্ধ হয়ে থাকা সম্ভব নয়। বন্ধুবান্ধবরা জোর করে খেলাধূলা ও শীকারের জন্য তাঁকে বাইরে নিয়ে আসতো। সিদ্ধার্থের পিতৃব্যপুত্র প্রায় তাঁর সমবয়সী ছিল। একসঙ্গে লেখাপড়া, খেলাধূলা, শিকার



করলেও দেবদত্ত সিদ্ধার্থকে ঈর্ষ্যার চোখে দেখতো। বড় হয়েও এই ভাবটা দেবদত্তর মন থেকে বিলুপ্ত হয়নি। বরং সে ভাবটা ক্রমশঃ বেড়ে চললো।

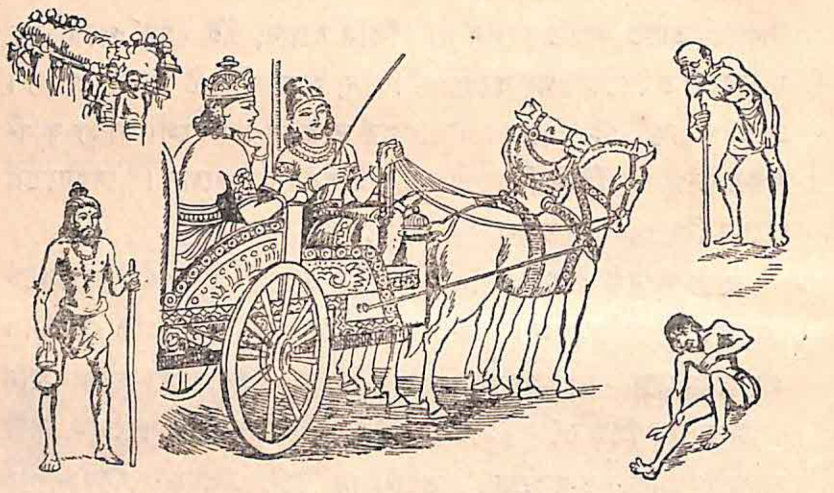
একদিন শীকার করতে গিয়ে এক ঘটনা ঘটলো। আকাশে

এক ঝাঁক হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। সকলের হাতেই তীর ছিল—অন্য কেউ লক্ষ্য করবার আগেই দেবদত্ত তীর ছুঁড়লেন—আর রক্তমাখা বুকে তীর শুদ্ধ একটা হাঁস মাটিতে পড়লো। দেবদত্ত ছুটে গেলেন হাঁসটাকে ধরবার জন্য কিন্তু গিয়ে দেখলেন তার আগেই সিদ্ধার্থ সেখানে গিয়ে শরাহত সেই হাঁসকে পরম যত্নে পরিচর্য্যা করছেন। দেবদত্ত হাঁসটিকে চাইলেন—কারণ তিনি তাকে তীর বিদ্ধ করেছেন অতএব ওটিতে তাঁরই অধিকার। সিদ্ধার্থ তাতে সম্মত হলেন না। তিনি বল্লেন, এই মুমূর্ষু প্রাণীটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন তিনি, অতএব ওটি তাঁরই প্রাপ্য। শেষ পর্য্যন্ত এই বিরোধ মীমাংসার ভার দেওয়া হলো শাক্য কুল-গুরুর উপর। তিনি সিদ্ধার্থের যুক্তিই সমর্থন করলেন। দেবদত্তের বিদ্বেষ সিদ্ধার্থর প্রতি আরো বেড়ে গেল।

শুদ্ধোদনের অনুমতি নিয়ে মাঝে মাঝে সিদ্ধার্থ রাজপথে বেড়াতে বার হতেন। কখনও বা রাজধানীর উপকণ্ঠে যেতেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে থাকতো সারথি ছন্দক। ছন্দক সদ্বংশের সন্তান আর বয়সে সিদ্ধার্থের চেয়ে একটু বড়। সিদ্ধার্থের সবচেয়ে বেশী ভালো লাগতো ছন্দককে। তার সঙ্গে তিনি অনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। একদিন রথে চড়ে ছন্দকের সঙ্গে সিদ্ধার্থ রাজধানীর উদ্যান-ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিছুদূর যাবার পর সিদ্ধার্থ দেখলেন এক অতি বৃদ্ধ লোক লাঠিতে ভর দিয়ে খুব কষ্টে পথ দিয়ে চলেছেন। তাঁর শরীর বয়সের ভারে নত হয়ে পড়েছে। চোখ কোটরগত। গায়ের চামড়া শুষ্ক হয়ে ঝুলে পড়েছে আর মাথার চুল সাদা। এই দৃশ্য দেখে সিদ্ধার্থ অভিভূত হয়ে পড়লেন—এই রকম দৃশ্য তাঁর চোখে আগে পড়েনি। তিনি ছন্দককে ডেকে বল্লেন: লোকটির এ রকম অবস্থা হয়েছে কি জন্য?

ছন্দক বল্লেন: লোকটির বার্দ্ধক্য হেতু শরীর জীর্ণ এবং দুর্ব্বল

হয়ে পড়েছে। এই লাঠির সাহায্য ছাড়া এক পা-ও চলবার ক্ষমতা নেই। বনের মধ্যে গাছের জীর্ণ ডাল যেমন মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়—ক্রমে সে কাঠ মাটিতে লীন হয়ে যায় ঐ লোকটির অবস্থাও তেমনি বার্দ্ধক্যের ভারে জীর্ণ হতে হতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সিদ্ধার্থ বিস্মিত হয়ে বল্লেন: এর কেন এই অবস্থা হয়েছে? কোনও পাপ কাজের ফলে কি এই দুর্গতি হচ্ছে?



ছন্দক বল্লেন: না প্রভু, তা নয়। মানুষ মাত্রই এই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। বৃদ্ধ হলে মানুষ অশক্ত হয়ে পড়ে তখন দেহ কুব্জ হয়ে পড়ে—পৃথিবীর এই নিয়ম।

সিদ্ধার্থের সেদিন আর বেড়াতে ভালো লাগলো না। মানুষের পরিণাম যদি এই হয় তাহলে বেঁচে থেকে সুখ কি! তিনি ছন্দককে বল্লেন: রথ ঘুরিয়ে নাও, আমি প্রাসাদে ফিরবো।

এরপর কিছুদিন কেটে গেছে। আবার একদিন ছন্দকের সঙ্গে ভ্রমণে গিয়ে সিদ্ধার্থ এক ব্যাধিগ্রস্ত মুমূর্ষু লোককে দেখলেন—তিনি আবার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন এই লোকটির

এ রকম অসহায় অবস্থা কেন হয়েছে? লোকটির আত্মীয় পরিজন কি কেউ নেই? মনে হচ্ছে সকলেই একে পরিত্যাগ করেছে। কোন পাপের জন্য লোকটির এই দুঃখ? এর কষ্ট যে চোখে দেখা যায় না।

ছন্দক বল্লে: পাপের জন্য কষ্ট পাচ্ছে—তা নয়। যারা দেহ ধারণ করে তাদের কোনো না কোনোদিন ব্যাধির প্রকোপে পড়তে হবে আর ব্যাধিগ্রস্ত লোক কষ্ট পাবে এই হলো জগতের নিয়ম।

ছন্দকের কথা শুনে সিদ্ধার্থের কোমল প্রাণে খুব আঘাত লাগলো। সেদিনও তিনি প্রাসাদে ফিরে এলেন।

আরো একদিন সিদ্ধার্থ যখন ছন্দকের সঙ্গে নগরের পশ্চিম-দ্বার দিয়ে উদ্যানের পথে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো এমন একটি দৃশ্যের প্রতি যা ইতিপূর্ব্বে কখনও তিনি দেখেননি। জনকয়েক লোক মিলে একটি লোককে কাঁধে নিয়ে যাচ্ছে। লোকটির সমস্ত দেহ শাদা কাপড়ে ঢাকা। যারা এই দেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—তারা সকলেই শোকাভিভূত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছিল। সিদ্ধার্থ ছন্দককে রথ থামাতে বল্লেন। তিনি কিছুক্ষণ এই শোকাবহ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে ছন্দকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। ছন্দক তাঁকে বল্লেন: যুবরাজ! এরকম দৃশ্য অহরহই ঘটছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করলে তার মৃত্যু হবেই। মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই লোকটি—যাকে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তার মৃত্যু হয়েছে; তাই তার আত্মীয় পরিজনরা তার জন্য শোকাভিভূত হয়ে পড়েছে।

সিদ্ধার্থ জানতে চাইলেন: এই কি জীবনের পরিণতি?

ছন্দক বল্লেন: হ্যাঁ তাই।

সিদ্ধার্থের আর কিছু ভালো লাগলো না—তিনি প্রাসাদে

ফিরে এলেন। সেদিন তিনি আর কারুর সঙ্গে দেখা করলেন না। কথা বললেন না। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে রইলেন।

এই যে উপর্য্যুপরি তিনটি দৃশ্যের অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল তাদের প্রত্যেকটি তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি শুধুই ভাবছিলেন—জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এর থেকে মানুষের পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব কিনা।

প্রথম গুরুগৃহে যেদিন বর্ণপরিচয় শিক্ষা আরম্ভ হয়েছিল সেদিন আদ্যক্ষর 'অ' পড়তে গিয়ে তাঁর অবচেতন মনে অনিত্য সংসার এই অনুভূতি জেগে উঠেছিল। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধোদন তার উপর সতর্ক সজাগ দৃষ্টি রাখলেন পাছে জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়ে ওঠে। কিন্তু শুদ্ধোদনের সাবধানতা সত্ত্বেও সিদ্ধার্থের মনে সংসারের প্রতি আসক্তি দেখা গেল না। জীবনধারণের সঙ্গে দুঃখ ও জরা মৃত্যুর যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে তার হাত থেকে মানুষকে নিষ্কৃতি পেতে হবে এই তাঁর একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। রাজকার্য্য তাঁর ভালো লাগতো না। বন্ধুবান্ধবদের সংসর্গ তাঁকে আনন্দ দিতো না। এমন কি তাঁর গুণবতী স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও তাঁর মনে তৃপ্তি হতো না।

অনেকদিন কেটে গেল। যুবরাজ প্রাসাদ থেকে বার হ'ন না। ছন্দক বহু অনুরোধ করে তাঁকে প্রাসাদ থেকে বাইরে নিয়ে আসতে পারলো না। একথা শুদ্ধোদনের কানে গেল। অবশেষে পিতার আদেশে আর ছন্দকের অনুরোধে সিদ্ধার্থ একদিন বাইরে এলেন। সেদিন রথে চড়ে তাঁরা নগরের উত্তর দ্বার দিয়ে উদ্যানের পথে যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে সিদ্ধার্থের চোখে পড়লো সৌম্য-মূর্ত্তি এক সন্ন্যাসী। তাঁর পরিধানে সামান্য পরিচ্ছদ, মস্তক মুণ্ডিত, হাতে ভিক্ষাপাত্র। সিদ্ধার্থ তাঁর দিকে তাকিয়ে মনে গভীর প্রশান্তি অনুভব করলেন। ভিক্ষুর সর্ব্বাঙ্গে করুণ কোমলতা। মুখে

পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা। দেখলেই মনে হয় তাঁর চাওয়া পাওয়ার সব শেষ হয়েছে।

ছন্দককে রথ থামাতে বলে সিদ্ধার্থ নিজেই এগিয়ে গেলেন। কাছে গিয়ে ভিক্ষুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর শান্ত সমাহিত সংযত মূর্ত্তি দেখে সিদ্ধার্থের মনে হলো তাঁর মনে যে প্রশ্ন জেগেছে—হয়তো তার উত্তর এঁর কাছে মিলবে। কিন্তু ভিক্ষু তাঁর প্রতি সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলেন। ছন্দক তখন তাঁর পাশে এসে বল্লেঃ প্রভু! এই ব্যক্তি গৃহ-সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। পার্থিব কোনো কিছুর মোহ এঁর কাছে নেই। জীবনধারণের জন্য যে সামান্য আহার্য্যের প্রয়োজন তারই সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি রাজধানীর পথে ভ্রমণ করছেন। কোনো একটি জায়গায় বেশীক্ষণ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

সেদিনও সিদ্ধার্থ প্রাসাদে ফিরে এলেন। ফিরে আসার পথে ছন্দক দু' একটি কথা আলোচনা করতে চাইলেন কিন্তু তিনি নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। প্রাসাদে ফিরে গিয়েও তিনি অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। গুরুগৃহে বর্ণপরিচয়ের সময় তাঁর মনে যে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল তার সদুত্তরের জন্য দীর্ঘকাল ধরে তিনি নিজের অন্তরে সন্ধান করেছেন। কিন্তু তাঁর সন্ধান সার্থক হয়নি। আজ এই ভিক্ষুর মূর্ত্তি দেখে তাঁর বার বার মনে হচ্ছিল এই সন্ন্যাসের পথেই হয়তো পথের সন্ধান পাবেন। এমনিতেই দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, আর বিলম্ব করা সঙ্গত নয়। এই ভেবে সিদ্ধার্থ সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন।

এই সময়ে তাঁর একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। এই সন্তানের জন্ম সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী ও রাজ্য জুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। সবাই খুব

খুসী কিন্তু সিদ্ধার্থ খুসী হতে পারছেন না, আনন্দের ভাগও নিতে পারছেন না। প্রথম যখন পুত্রের জন্ম সংবাদ তাঁর কাছে দেওয়া হলো তখন তিনি নাকি বলেছিলেন "রাহুলো জাতো"—শত্রুর জন্ম হলো। অর্থাৎ সংসারের বন্ধন বাড়লো। এই জন্যই পুত্রের নাম রাখা হয়েছিল 'রাহুল'।

ছন্দকের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধার্থ স্থির করলেন যে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। ছন্দক তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলো—সংসারের প্রতি, পিতা-পুত্র-পত্নীর প্রতি, প্রজাদের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করে এই সঙ্কল্প ত্যাগ করতে অনুরোধ করলো। ছন্দক বল্লে ঃ দেব, সম্প্রতি আপনার একটি পুণ্যলক্ষণ পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে। সে চতুর্দ্দিকের অধিপতি হবে। আপনি বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্তু রাজ্য সমৃদ্ধ ও রমণীয়, আপনি কি কারণে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছেন? কিন্তু সিদ্ধার্থের সঙ্কল্প অটল হয়ে রইল। তিনি বল্লেন ঃ ছন্দক, আমি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি কাম্য বস্তু ইহলোকে এবং দেবলোকে অনন্ত কল্পকাল ভোগ করেছি কিন্তু কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয়নি। আমি গৃহত্যাগ করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় প্রজ্জ্বলিত লৌহ, আগ্নেয় গিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে পতিত হোক—আমি গৃহস্থাশ্রমে কিছুতেই আবদ্ধ হয়ে থাকবো না।

সিদ্ধার্থের এই সঙ্কল্প দেখে ছন্দক তাঁকে আর প্রতিনিবৃত্ত করতে চাইলো না। তারপর একদিন গভীর রাত্রে সিদ্ধার্থের কথামত ছন্দক রথ সুসজ্জিত করে প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করে রইল। রাত্রির দ্বিতীয় যামে সিদ্ধার্থ প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন। রাজপ্রাসাদের সবাই নিদ্রায় অচেতন হয়ে রইল। এমন কি স্ত্রী গোপা সেই নবজাতক রাহুলের পাশে ঘুমে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলেন। প্রাসাদের ঘর ছেড়ে আসবার আগে সিদ্ধার্থ একবার

স্ত্রী-পুত্রের ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। সুবর্ণের দীপাধারে মৃদু আলো জ্বলছিল—তারই অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলেন ঘুমন্ত গোপার মুখচ্ছবি, তাঁর একখানি হাত নবজাত পুত্রের মুখের উপর প্রসারিত রয়েছে। তাই রাহুলের সবটুকু মুখ সিদ্ধার্থ স্পষ্ট দেখতে পেলেন না। তারপর পিতা শুদ্ধোদন যে ঘরে নিদ্রিত সেই দ্বার-



প্রান্তে গিয়ে একবার অনুচ্চস্বরে বল্লেন ঃ পিতা, আশীর্ব্বাদ করুন আমার প্রব্রজ্যা সফল হোক! মাতা মহাপ্রজাবতীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ধীরে ধীরে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর সেই গমনপথের সাক্ষী হয়ে রইল ঘুমন্ত রাজপুরী, আকাশ ভরা নক্ষত্রের দল আর রাত্রির দ্বিতীয় যামের স্তিমিত চাঁদ।

প্রাসাদের বাইরে ছন্দক অপেক্ষা করছিল। সিদ্ধার্থ ইসারা করতেই সে রথ নিয়ে এগিয়ে এলো। সিদ্ধার্থ রথে চড়লেন—পিছন ফিরে তাকালেন না। রাত্রির স্তব্ধতা আর অন্ধকার ভেদ করে

ছুটে চললো রথ। পিছনে পড়ে রইল রাজ্য, রাজধানী, প্রাসাদ ও প্রিয়জন।

সারারাত ধরে রথ চললো। শাক্য রাজধানীর উপকণ্ঠে কোভ্য, মল্ল, মৈনেয় প্রভৃতি যে সকল জনপদ অবস্থিত ছিল সেই সব জনপদ অতিক্রম করে রথ এগিয়ে চললো। ছয় যোজন পথ অতিক্রম করার পর ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে রথ যেখানে এসে থামলো, তারই অদূরে এক স্বচ্ছসলিলা নদী। রথ থেকে নেমে সেই নদীতে স্নান করে সিদ্ধার্থ তাঁর গা থেকে একে একে রত্ন অলঙ্কার খুলে ফেল্লেন। সেগুলো ছন্দকের হাতে দিয়ে তাকে রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করতে বল্লেন। ছন্দক চোখের জল ফেলতে ফেলতে তার প্রিয় সঙ্গী এবং প্রভুকে ছেড়ে ফিরে এলো রাজধানীতে। তারপর সিদ্ধার্থ অরণ্যপথ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তাঁর সঙ্গে দেখা হলো এক ব্যাধের সঙ্গে। তার পরিধানে কাষায় বস্ত্র। সিদ্ধার্থ তার কাছে থেকে সেই বস্ত্রখানি চেয়ে নিয়ে পরিবর্ত্তে তাকে কৌষিক বস্ত্র দিলেন। তারপর মাথা থেকে চূড়া খুলে ফেলে ব্যাধের অস্ত্র দিয়ে নিজের চুল কেটে ফেললেন। তারপর ব্যাধের দেওয়া সেই বস্ত্রখানি পরে অজানা যাত্রার পথে এগিয়ে চল্লেন।

যে জায়গায় সিদ্ধার্থ ছন্দককে বিদায় দিয়েছিলেন সে জায়গার নাম ছিল 'অনুপ্রিয়'।

ছন্দক কপিলবাস্তুতে গিয়ে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের খবর জানালেন। তখন সকলেই দুঃখ শোকে অধীর হয়ে পড়লেন। রাজা শুদ্ধোদন, মহাপ্রজাবতী গৌতমী, বধূ গোপা সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করতে লাগলেন। সমস্ত রাজধানী দুঃখসাগরে নিমগ্ন হয়ে গেল। তারপর ছন্দক যখন সিদ্ধার্থের রত্নালঙ্কার আভরণাদি মহাপ্রজাবতীর হাতে দিলেন—গভীর দুঃখে ও পুত্রবিরহে অশ্রুমুখী মহাপ্রজাবতী অলঙ্কারগুলি নিকটবর্ত্তী এক পুষ্করিণীতে

ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। নিজের দুঃখ ছাড়াও রাজা ও পুত্রবধূর মনোবেদনা তাঁর পক্ষে সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ছিল।

গোপাও নিজের ভ্রমর কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ কেটে, অঙ্গের আভরণাদি পরিত্যাগ করে অত্যন্ত দীনহীন বেশে কাল যাপন করতে লাগলেন।

ছন্দককে বিদায় দিয়ে সিদ্ধার্থ অনুপ্রিয় গ্রামের এক আম্রবনে আশ্রয় নিলেন। কোথায় যাবেন, কোন্ পথে গেলে তাঁর অন্তরের জিজ্ঞাসার উত্তর পাবেন এই নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। সেই আম্রবনের পাশে শাক্যা ও পদ্মা নামে দু'জন ব্রাহ্মণী থাকতেন। সেই নির্জ্জন আম্রকাননের ভিতর ঐরকম সৌম্য-কান্তি তরুণকে দেখতে পেয়ে তাঁরা তাঁকে বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন। সেখানে দু' একদিন আতিথ্য গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ



রৈবত নামে এক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে এলেন। সেখানে দিন কয়েক বিশ্রামের পর সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরীতে উপস্থিত হলেন। বৈশালী ছিল লিচ্ছবিদের রাজধানী। রাজধানী হবার উপযুক্ত জায়গাই বটে!

অনেক সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়ী মন্দির সেখানে ছিল। তাছাড়া আর্য্যাবর্ত্তে লিচ্ছবি বংশ তখন খুব পরাক্রান্ত শক্তি বলে গণ্য করা হতো। শুধু রাজধানী বলে নয়—তখনকার যুগে জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল এই বৈশালী। বৈশালীর খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সিদ্ধার্থ ভেবেছিলেন যে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও জ্ঞান চর্চ্চা করলে তিনি তাঁর অভীষ্ট লাভ করতে পারবেন। লিচ্ছবি রাজধানীতে বহু বিদ্বজ্জনের বাস ছিল, তাই সিদ্ধার্থ বৈশালীকেই তাঁর বাসস্থান বলে মনোনীত করেছিলেন। বৈশালীতে যে সব পণ্ডিত থাকতেন তাদের মধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ হিসাবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন কালাম নামে এক উপাধ্যায়। কালামের তিনশতের বেশী শিষ্য ছিল। সিদ্ধার্থের সঙ্গে কথা বলে কালাম প্রীত হলেন। তিনি সিদ্ধার্থকে তাঁর শিষ্য বলে গ্রহণ করলেন। তারপর দীর্ঘদিন ধরে চললো কালামের গৃহে সিদ্ধার্থের অধ্যয়ন। বহু শাস্ত্র অধীত হলো কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁর প্রশ্নের সদুত্তর পেলেন না। কি করে মানুষ দুঃখ, জরা, শোক, মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে—তাঁর অনুসন্ধানী মন শাস্ত্র থেকে সে সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত পেলো না। কালামের যতটুকু দেবার ছিল সবই তিনি সিদ্ধার্থকে নিঃশেষে দান করলেন, কিন্তু তাঁর এ নবীন শিষ্যটি তাতে পরিতৃপ্ত হলো না।

তারপর সিদ্ধার্থ এলেন শ্রাবস্তী নগরে। শ্রাবস্তী ছিল কোশলের রাজধানী। বৈশালীর মতই সমৃদ্ধ ছিল শ্রাবস্তী নগরী। এখানেও শাস্ত্রজ্ঞ বহু পণ্ডিত বাস করতেন। উদ্রক নামে সেখানে এক কৃতবিদ্য অধ্যাপক ছিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেন, কিন্তু তাতেও তিনি পরিতৃপ্ত হলেন না। যে প্রশ্নের সদুত্তর জানবার জন্য স্বদেশ স্বজন পরিত্যাগ করে, সংসার ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন সে প্রশ্ন তাঁর কাছে এখনও অমীমাংসিত থেকে গেল।

শ্রাবস্তী ছেড়ে সিদ্ধার্থ এলেন মগধ রাজ্যের রাজধানী—রাজগৃহে। তখন মগধের রাজা ছিলেন বিম্বিসার। ধনে জনে পরিপূর্ণ ছিল এই নগর। এইখান থেকে সিদ্ধার্থ শাস্ত্র অধ্যয়ন করবেন বলে স্থির করলেন। দিনের বেশীর ভাগ সময় অধ্যয়নে অতিবাহিত হতো, আর যেটুকু অবসর পেতেন তখন তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরে তণ্ডুল সংগ্রহের জন্য ঘুরতেন। নিজের দেহরক্ষার জন্য যেটুকু আহার্য্য প্রয়োজন হতো সেটুকু সংগ্রহ হলেই তিনি গৃহে ফিরে আসতেন। একদিন ভিক্ষালব্ধ অন্ন রন্ধন করতে গিয়ে দেখলেন যে মানুষের পক্ষে এ আহার্য্য অনুপযুক্ত। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁর মনে ইতস্ততঃ ভাব এলো যে কি করে এই অন্নগ্রহণ করবেন ; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর মনে হলো তিনি ভিক্ষু, অতএব ভিক্ষালব্ধ অন্ন যেরকমই হোক না কেন সেটা গ্রহণ করা তাঁর কর্ত্তব্য, বর্জ্জন করার তাঁর অধিকার নেই।

এমনি করে ভিক্ষা আর শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সিদ্ধার্থের রাজগৃহ বাসের দিন একটা একটা করে অতিক্রান্ত হতে লাগলো। এই তরুণ সন্ন্যাসীর কথা রাজা বিম্বিসারের কানেও পৌঁছল। নাগরিকরা এঁকে নিয়ে অনেক সময় নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতেন। তরুণ বয়সে সন্ন্যাসী হয়েও এঁর চালচলনে এক অনন্যসাধারণ আভিজাত্যের ছাপ দেখা যেতো। তাঁকে দেখে মনে হতো একটা পরম নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য যেন তাঁকে ঘিরে আছে। পৃথিবীর মানুষ হয়েও পার্থিব সব আকর্ষণ থেকে তিনি এই বয়সেও যেন পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করেছেন। বিম্বিসারের খুব আগ্রহ হলো এই সন্ন্যাসীকে দেখবার। একদিন তিনি তাঁর রাজ-প্রাসাদের গবাক্ষ থেকে ভিক্ষাজীবী তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখলেন কিন্তু শুধু চোখে দেখে তিনি পরিতৃপ্ত হলেন না। তাঁর ভারী ইচ্ছা হলো সন্ন্যাসীকে ডেকে আলাপ করবেন। তিনি অনুচর পাঠিয়ে সন্ন্যাসীকে আমন্ত্রণ জানালেন। সাধারণ গৃহীদের বাড়ীতেই ভিক্ষার

জন্য সন্ন্যাসী দ্বারস্থ হতেন। কতবার রাজপ্রাসাদের সামনে দিয়ে গেছেন কিন্তু রাজপ্রাসাদে ভিক্ষার্থী হয়ে আসেননি। রাজার আমন্ত্রণ জেনে তিনি প্রথমে দ্বিধাগ্রস্ত হলেন—পরে রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়—এই কথা ভেবে তিনি রাজপ্রাসাদে এলেন। বিম্বিসার তাঁকে দেখে পরম প্রীত হয়ে বল্লেন: আপনি ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এতে আমি অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করছি। আপনি আমার সম্পত্তি গ্রহণ করুন। আপনাকে আমার সমস্ত রাজ্য দান করতেও আপত্তি নেই। আপনি গ্রহণ করে আমায় কৃতার্থ করুন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁর দান গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন। বিষয় বাসনা থেকে নিবৃত্তি লাভ করার জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করে এসেছেন—আবার সাংসারিক দায়িত্ব! বিষয় সম্পত্তি গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বিম্বিসার তখন তার কাছে জানতে চাইলেন কোনদেশে তাঁর জন্ম, কোথাকার লোক তিনি, তাঁর পিতা মাতা কারা?

বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে সিদ্ধার্থ জানালেন—শাক্যনায়ক শুদ্ধোদন তাঁর পিতা। কপিলবাস্তু তাঁর জন্মভূমি। কি অভিপ্রায়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছেন সে কথাও তিনি বল্লেন—বুদ্ধত্ব লাভই তাঁর সঙ্কল্প।

তাঁর কথা শুনে বিম্বিসার অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি বল্লেন: আপনি যদি বুদ্ধত্ব লাভ করতে সমর্থ হন তাহলে আপনি রাজগৃহে ফিরে আসবেন, আমায় কথা দিন। আপনার দর্শন পেয়ে আমরা ধন্য হবো। সিদ্ধার্থ প্রতিশ্রুত হলেন।

এরপর সিদ্ধার্থ রাজগৃহ ছেড়ে গয়ায় এলেন। গয়ার কাছাকাছি একটি নির্জ্জন পাহাড় তাঁর সাধনার উপযুক্ত হবে ভেবে তিনি নিঃসঙ্গ জীবন যাপনের উদ্যোগ করলেন কিন্তু বেশীদিন এখানে থাকা সম্ভব হলো না। গভীর শ্বাপদসঙ্কুল এস্থান তিনি শীঘ্রই পরিত্যাগ করলেন। সিদ্ধার্থ এবার উরুবিল্ব নামে একটি গ্রামে উপস্থিত হলেন। এই গ্রামের পাশ দিয়ে নৈরঞ্জনা নদী। এখানকার পরিবেশ সিদ্ধার্থের

খুব ভালো লাগলো। নৈরঞ্জনার তীরে একটি ছায়াঘন নির্জ্জন স্থান বেছে নিয়ে তিনি তপশ্চর্য্যায় উদ্যোগী হলেন। শাস্ত্র অধ্যয়ন করে জ্ঞানচর্চ্চা করে তিনি তাঁর ভাণ্ডারে উল্লেখযোগ্য কিছুই সঞ্চয় করতে পারেননি। শুষ্ক জ্ঞানচর্চ্চার পথে তাঁর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না জেনে তিনি এবার কৃচ্ছ্র সাধনের সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে পাঁচজন ভিক্ষু যোগ দিয়েছিলেন। তাঁরাও তাঁরই মত তপশ্চর্য্যার পথে মুক্তির সন্ধান পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করতেন। এইখানে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে দিনের পর দিন ধরে চললো কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত চললো কঠোর তপশ্চর্য্যা। শরীরকে যত রকম ভাবে কষ্ট দেওয়া যায় তার সব কয়টি প্রক্রিয়া মেনে চল্লেন।

প্রথমে তিনি খুব অল্প আহার গ্রহণ করতেন, ক্রমে তিনি সমস্ত দিনে একটিমাত্র তিল অথবা তণ্ডুল আহার করতেন। তাঁর শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো। এই সময়কার তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তিনি পরে বর্ণনা করেছিলেন ঃ "আমার শরীর এরূপ শুষ্ক হইয়া গেল যে আমি যেখানে বসিতাম সেখানে উষ্ট্র পদচিহ্নের মত ছাপ পড়িত, চক্ষুর্দ্বয় কোটরগত হইয়া গভীর কূপের তলদেশস্থ জলের মত বোধ হইত। উদর স্পর্শ করিলে মেরুদণ্ড হাতে ঠেকিত, মেরুদণ্ড স্পর্শ করিলে উদর হাতে ঠেকিত, গায়ে হাত বুলাইলে রোম ঝরিয়া পড়িত।"

কত মাস, কত ঋতু অতিক্রান্ত হলো কিন্তু সিদ্ধার্থের একাগ্রচিত্ত তপস্যার বিরাম নেই। ক্রমে তাঁর শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হলো— একদিন তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। যাঁরা তাঁর কাছাকাছি ছিলেন তাঁদের মনে হলো সিদ্ধার্থের মৃত্যু হয়েছে। এ সংবাদ কপিলবাস্তুতে শুদ্ধোদনের কাছে পৌঁছল। সংবাদবাহকের কাছে শুদ্ধোদন জানতে চাইলেন পুত্রের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর মৃত্যু হয়েছে কিনা?

সংবাদবাহক কোনো সদুত্তর দিতে পারলো না। কিন্তু পরে সংবাদটা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো।

কিছুক্ষণ পরে সিদ্ধার্থ জ্ঞান ফিরে পেয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরে পাবার পর তাঁর মনে হলো কৃচ্ছ্র সাধনের পথে মুক্তি লাভ যদি সম্ভব হতো তাহলে তাঁর সম্যক জ্ঞান পেতে বিলম্ব হতো না। তপশ্চর্য্যায় রত হয়ে তিনি মৃত্যুর দ্বার পর্য্যন্ত গেলেন তবু মুক্তিপথের সন্ধান পেলেন না! কিন্তু সিদ্ধার্থ নিরুৎসাহ হলেন না, মুক্তিলাভের জন্য তিনি সুখ ঐশ্বর্য্য আত্মীয় পরিজন ত্যাগ করে এসেছেন—সেই মুক্তিলাভ না করা পর্য্যন্ত তিনি নিবৃত্ত হবেন না। এই সঙ্কল্প নিয়ে নূতনতর উৎসাহে তিনি সাধনার পথে অগ্রসর হলেন।

নৈরঞ্জনা নদীর তীরে যে স্থানটি তিনি কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এবার তারই অদূরে ঘন বনের অন্তরালে তিনি একটি নির্জ্জন স্থান তাঁর নূতন সাধনার ক্ষেত্র বলে নির্ব্বাচিত করলেন। সেই বনের একপ্রান্তে বনস্পতির দল যেখানে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সবুজ পাতায় ঢাকা একটি বিরাট অশ্বত্থ গাছের নীচে সিদ্ধার্থ ধ্যান নিমগ্ন হলেন। এবার তাঁর দুর্জ্জয় সঙ্কল্প—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।' ধ্যাননিবিষ্ট হবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তিনি স্বগতোক্তি করেছিলেন :

"ইহাসনে শুষ্যতে মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্ল্ভং নৈবাসনা কায়মতশ্চলিষ্যতে"॥

অর্থাৎ—এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক এবং আমার ত্বক অস্থি ও মাংস এই স্থানে বিলীন হোক কিন্তু সুদুর্ল্ভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।

এইবার সিদ্ধার্থ ধ্যানে প্রবৃত্ত হলেন কিন্তু তিনি কৃচ্ছ্র সাধনের পথ বর্জ্জন করে চললেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত

নিবিষ্টচিত্তে ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। কখনও ধ্যানভঙ্গে চক্ষু উন্মীলিত করতেন, তখন আহার্য্য যদি কিছু থাকতো তা গ্রহণ করতেন। নিয়মিতভাবে প্রতিদিন আহার্য্য পেতেন না। এই ভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হবার পর একদিন ধ্যানভঙ্গ হবার পর সিদ্ধার্থ তাঁর সম্মুখে দেখতে পেলেন একটি তরুণী তাঁকে পরমান্ন নিবেদন করছেন। এই তরুণীর নাম সুজাতা—ইনি উরুবিল্ব গ্রামের এক গোপগৃহের বধূ। বিবাহের পরে পুত্রসন্তান লাভ



না হওয়ায় ইনি সঙ্কল্প করেছিলেন যে যদি দেবতাদের আশীর্ব্বাদে তিনি পুত্রলাভ করেন তাহলে তিনি দেবতাদের প্রীতি কামনায় পরমান্ন নিবেদন করবেন। যথাকালে সুজাতা পুত্রবতী হলেন। তাঁর সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করে তিনি একদিন স্নানান্তে, পবিত্র দেহে, পরমান্ন নিয়ে নৈরঞ্জনা তীরে উপস্থিত হলেন। সেখানে অশ্বত্থ বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্ন দিব্যকান্তি, সিদ্ধার্থকে দর্শন করে তাঁর মনে হলো ইনিই তাঁর আরাধ্য দেবতা। সুজাতা পরমান্ন নিয়ে সিদ্ধার্থের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন ধ্যান

ভঙ্গ হলো তখন ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে সুজাতা তাঁর প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সিদ্ধার্থ সে অনুরোধ রক্ষা করলেন। এই ঘটনায় সিদ্ধার্থের পাঁচজন সঙ্গী অত্যন্ত মর্ম্মাহত হলেন। তাঁরা ভাবলেন সিদ্ধার্থ সুজাতা প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করে তপস্বীর আদর্শচ্যুত হয়েছেন। তাঁরা সিদ্ধার্থকে ত্যাগ করে উরুবিল্ব থেকে চলে গেলেন। এর পর থেকে সুজাতা প্রায়ই গোপকন্যাদের সঙ্গে আসতেন এবং সিদ্ধার্থকে পরিচর্য্যা করে আহার্য্য গ্রহণ করাতেন। এই নির্জ্জন বনে নিঃসঙ্গ অবস্থায় সিদ্ধার্থের তপঃক্লিষ্ট দেহে শক্তি ও সামর্থ্য ফিরিয়ে আনতে সুজাতা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। আর এই কারণে বৌদ্ধ সাহিত্যে সুজাতার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

সিদ্ধার্থের সঙ্কল্প এবং তপস্যার কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হলে তাঁর উদ্দেশ্যের সাফল্য সকলেই কামনা করলো কিন্তু একজন তাঁর সাফল্যের সম্ভাবনায় রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লো। কামদেব বা মার সিদ্ধার্থের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করতে চাইলো। প্রথমে সিদ্ধার্থের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে তার বাক্‌যুদ্ধ চললো। নানা কথায় ও প্রলোভনে সে সিদ্ধার্থকে তাঁর অভীষ্ট থেকে বিচ্যুত করতে চাইলো। কিন্তু সিদ্ধার্থের সঙ্কল্প অটুট রইল। মারের সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হলো তখন মার তার অনুচরদের নিয়ে সিদ্ধার্থের সঙ্গে সশস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলো কিন্তু এবারেও সিদ্ধার্থ জয়ী হলেন। পরাজিত মার অনুচরদের নিয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলো। তারপর থেকে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে সিদ্ধার্থের একাগ্রচিত্ত সাধনা।

মারকে পরাভূত করার পর থেকে সিদ্ধার্থের সঙ্কল্প দৃঢ়তর হয়ে উঠলো। তার মুখে চোখে ফুটে উঠলো এক অপূর্ব্ব প্রশান্তি, সমস্ত অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো স্বর্গীয় আনন্দোজ্জ্বল জ্যোতিতে। তাঁর মনের বিভিন্ন বৃত্তি এবার সমাধির পরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে

চললো। অবশেষে একদিন রাত্রির প্রথম যামে সিদ্ধার্থের দিব্যচক্ষু উন্মিলীত হলো। তিনি প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান পেলেন। মধ্যম যামে তাঁর পূর্ব্বতন জীবনের অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ হলো। রাত্রির শেষ যামে তিনি লাভ করলেন সম্যক্ জ্ঞান বা বোধি।

ছ'বছর আগে একদিন রাতের অন্ধকারে সেই কপিলবাস্তুর রাজকুমার নিস্তব্ধ রাজপুরী থেকে প্রিয়জনের সঙ্গ ত্যাগ করে মহান সত্যের সন্ধান পাবার জন্য গৃহত্যাগ করেছিলেন। দুঃখ কষ্ট ত্যাগ স্বীকারের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ছ'টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে—তাঁর সেই দীর্ঘ প্রতীক্ষা আজ সার্থক হয়েছে। যে অজ্ঞেয় রহস্যকে জানবার জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠেছিলেন সেই রহস্য আজ তাঁর মনে সম্পূর্ণ উদ্ঘাটিত হয়েছে। আজ তাঁর সাধনা সিদ্ধ হয়েছে। তিনি পেয়েছেন সম্যক্ বোধ বা বোধি। তাই তিনি বুদ্ধ। আজ তাঁর মনের সব সংশয় অন্তর্হিত হয়েছে। সত্য উপলব্ধির যে আনন্দ তাতে তাঁর অন্তর আজ পরিপূর্ণ। দুঃখ শোক জরা মৃত্যুর হাত থেকে মুক্ত করার উপায় তিনি জেনেছেন—সকল বন্ধন, সকল কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করার নামই নির্ব্বাণ। যে পথে গেলে এই অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়—সেই পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন, তাই তিনি তথাগত।

বোধি লাভ করার পর মনে যে দুর্জ্জয় আবেগ এসেছিল তারই প্রেরণায় সিদ্ধার্থ ক'দিন ধরে ঘুরে বেড়ালেন নৈরঞ্জনার তীরে উরুবিল্ব গ্রামে ও তার আশেপাশে। যে সত্যের উপলব্ধি তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল সেই পরম সত্যকে তিনি শুধু নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইলেন না—সেই সত্যকে পরিব্যাপ্ত করে দিতে চাইলেন দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে। কিন্তু তার জন্য প্রস্তুতির প্রয়োজন, তাই এই উপলব্ধির পরেও কিছু দিন তিনি বোধিদ্রুম তলে অতিবাহিত করলেন। এই সময় তিনি কি ভাবে তাঁর মত সাধারণের মধ্যে প্রচার করবেন সে সম্পর্কে তাঁর

কর্ম্মপন্থা স্থির করলেন। অনেক সময় দেখা যেত নির্জ্জন বনে তিনি একাকী পরিভ্রমণ করছেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠতো সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিতে দেখা যেতো অপূর্ব্ব প্রশান্তি।

সংসারের আসক্তি থেকে তিনি বহু পূর্ব্বেই মুক্ত হয়েছিলেন। সাংসারিক সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগের বাসনা তার মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল তবু তাঁর মনে হলো তাঁর উপলব্ধ সত্য জনসাধারণের কাছে প্রচার করার আগে তাঁকে নির্ব্বাসনার সাধনায় সিদ্ধ হতে হবে। উরুবিল্বতে থাকতেই তিনি শ্মশান থেকে একখণ্ড পরিত্যক্ত বস্ত্র সংগ্রহ করে তাকে পরিধেয় বলে নির্ব্বাচন করলেন। সিদ্ধার্থের সাধনার শেষ ক'টি দিন যে গোপ-বধূ সুজাতার যত্নে ও সেবায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল—সেই সুজাতার গৃহে রাধা নামে একটি পরিচারিকা ছিল। বোধি লাভ করার পর যখন তিনি উরুবিল্বতে অবস্থান করছিলেন তখন রাধার মৃত্যু হয়েছিল। সেই রাধার পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিস্কৃত করে বুদ্ধ চীবর প্রস্তুত করেছিলেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নে উদরপূর্ত্তি আর পরিত্যক্ত বস্ত্রে অঙ্গ আচ্ছাদন করে বুদ্ধ সাংসারিক ঐশ্বর্য্য ভোগের আকাঙ্ক্ষাকে নির্মূল করতে চেয়েছিলেন আর তাঁর প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফলও হয়েছিল।

জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মমত প্রচার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর সিদ্ধার্থ উরুবিল্ব ছেড়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে উপক নামে এক সাধুর দেখা হলো। সিদ্ধার্থের প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখে উপক তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "তোমার বর্ণ উজ্জ্বল ও সুন্দর, তোমার মুখশ্রী কমনীয়, তুমি কার কথায় সংসার ত্যাগ করলে? কে তোমার গুরু?" তার উত্তরে সিদ্ধার্থ বল্লেন: "আমি সর্ব্বত্যাগী, আমি পূর্ণ জ্ঞানলাভ করেছি, আমি বুদ্ধ।" উপক এই উত্তরে খুসী হতে পারেননি। তাঁর মনে হয়েছিল এটি দম্ভোক্তি। যাই হোক, উপক তাঁকে আরো জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার গন্তব্য স্থান কোথায়?" তার উত্তরে তিনি বল্লেন:

বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশীকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্তিষ্যে লোকেষু অপ্রাতিবর্ত্তিতম্।"

অর্থাৎ আমি বারাণসী গমন করিব এবং কাশীকা পুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিব। এই কথাটিও উপকের ভালো লাগেনি ; তিনি শ্লেষ ভরে বল্লেন ঃ "হে গৌতম, আমি প্রস্থান করলাম। তোমার গন্তব্য স্থল এখনও অনেক দূরে।" গৌতম তাঁর উপলব্ধ সত্যের আলোকে এত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁর কথাবার্ত্তা চালচলন অন্যের কাছে দাম্ভিক বলে মনে হতে পারে সে সম্ভাবনা তাঁর মনে দেখা দেয়নি। উরুবিল্ব ছেড়ে আরো কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর সিদ্ধার্থকে আমন্ত্রণ জানালেন সুদর্শন নামে এক রাজা। তিনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কিছুদিন এই রাজার সভায় বাস করেছিলেন। তারপর তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চল্লেন বারাণসী। তাঁর সিদ্ধিলাভের কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁর যে পাঁচজন সঙ্গী তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন তাঁরা বারাণসীর কাছাকাছি ঋষিপত্তন বা সারনাথে তপশ্চর্য্যা করছিলেন। সিদ্ধার্থ তাঁর আবিষ্কৃত মহান সত্য প্রথমে এই পাঁচজন শিষ্যের কাছে উদ্‌ঘাটিত করবেন বলে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। গয়া থেকে সারনাথের দূরত্ব সামান্য নয়। পদব্রজে এগিয়ে চলেছেন ভিক্ষু। পথে কয়েকটি জায়গায় বিশ্রাম করার পর তিনি গঙ্গাতীরে উপস্থিত হলেন। তখন বর্ষাকাল। কূলে কূলে জল উপছে পড়ছে। নদী পার হওয়া আবশ্যক এবং তার জন্য খেয়ার সাহায্য দরকার কিন্তু সঙ্গে একটি কপর্দ্দকও নেই। মাঝি তাঁকে পার করতে চাইলো না। শেষে অনেক অনুরোধ উপরোধের পর এবং অন্য কয়েকজন পারার্থীর মধ্যস্থতায় মাঝি তাঁকে পার করে দিল। অনেকদিন পরে রাজা বিম্বিসার এই কথা শুনে আদেশ করলেন যে ভবিষ্যতে কোনও সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুকে নদী পার করবার জন্য কোনও শুল্ক আদায় করা বেআইনী হবে।

৩

নদী পার হয়ে সিদ্ধার্থ বারাণসীর সারনাথ বা ঋষিপত্তনের দিকে অগ্রসর হলেন। এই স্থানের মৃগদাবে তাঁর সেই পাঁচজন সঙ্গী কিছুকাল থেকে এ অঞ্চলে বাস করছিলেন। এঁদের কাছেই তাঁর ধর্ম্ম প্রথম প্রচার করবেন এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধার্থ মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে সিদ্ধার্থের দিব্যকান্তি আর স্বাস্থ্যমণ্ডিত দেহশ্রী দেখে সেই পঞ্চভিক্ষু ভাবলেন সিদ্ধার্থ তপশ্চর্য্যা-আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে এই সুখ ভোগের পথ বেছে নিয়েছিলেন, সুতরাং তাঁদের কাছে তিনি আদর্শ-ভ্রষ্ট—এর জন্য সিদ্ধার্থকে আসতে দেখে তাঁরা স্থির করলেন যে তাঁর সঙ্গে তাঁরা কথা পর্য্যন্ত বলবেন না, উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান বা অভ্যর্থনা কোনোটাই করবেন না। তারপর তাঁরা শুধু একখানা আসন বিছিয়ে রাখলেন যদি সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হয় তাহলে তিনি উপবেশন করতে পারেন। সিদ্ধার্থ যথাকালে সেখানে উপস্থিত হলেন—কিন্তু কি আশ্চর্য্য তিনি ভিক্ষুদের নিকটস্থ হওয়া মাত্র তাঁদের সঙ্কল্প ব্যর্থ হলো। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই তাঁরা উঠে দাঁড়িয়ে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানালেন। পূর্ব্বের অভ্যাস মত তাঁরা নবাগতকে গৌতম বলে সম্বোধন করলেন কিন্তু আগন্তুক তাঁদের বল্লেন: "বন্ধুগণ, আমি সাধনা বলে সম্যক্ জ্ঞান বা বোধি লাভ করেছি; সুতরাং আমি 'বুদ্ধ'। আমি সেই পথের সন্ধান পেয়েছি যে পথে গেলে মানুষ দুঃখ কষ্ট জরা মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে সুতরাং আমি 'তথাগত'। অতএব আমি অনুরোধ করি তোমরা আমাকে পূর্ব্বনাম ধরে ডাকবে না। এখন থেকে আমি বুদ্ধ বা তথাগত নামে পরিচিত হবো।" তিনি আরো বল্লেন যে উরুবিল্ব থেকে তিনি সারনাথে এসেছেন তাঁর নবলব্ধ উপলব্ধি তাঁর সঙ্গীদের কাছে সর্ব্বপ্রথম প্রচার করার সঙ্কল্প নিয়ে। সঙ্গীরা যদি সম্মত হন তাহলে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্য তাঁদের কাছে ব্যক্ত করবেন।

সঙ্গীরা সম্মত হলেন। বুদ্ধ আসন পরিগ্রহ করে তাঁর ধর্ম্মমত

প্রচার করতে উদ্যত হলেন। মৃগদাবের নির্জ্জন প্রান্তরে সেই সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে বুদ্ধকণ্ঠে সেদিন প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম্মের মূল ব্যাখ্যা।

সেদিন বুদ্ধ পঞ্চভিক্ষুর কাছে যা বলেছিলেন তার সার মর্ম্ম এই —জীবনধারণ করলে দুঃখ অপরিহার্য্য। কর্ম্মফলের উপরে জীবনের অভিজ্ঞতা নির্ভর করে। সৎকর্ম্ম দ্বারা মানুষ উন্নততর জীবন যাপনের অধিকারী হয় আবার নীচ কর্ম্ম দ্বারা মানুষ নিম্নতর জীবন পরিগ্রহ করতে বাধ্য হয়। শোক তাপ জরা মৃত্যু এরা দুঃখের প্রতীক। তৃষ্ণা সকল দুঃখের মূল। বাসনার তাড়নায় মানুষ একটির পর একটি অত্যন্ত কর্ম্মের শৃঙ্খল রচনা করে চলেছে এবং যতদিন মানুষ এই কর্ম্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করতে না পারে ততদিন মানুষের পক্ষে দুঃখের কবল থেকে উদ্ধার লাভ সম্ভব নয়। তৃষ্ণা নিবৃত্তি দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায়। তৃষ্ণার নিবৃত্তি নামই 'নির্ব্বাণ।' এই নির্ব্বাণ লাভ করার জন্য তিনি যে পথ বা পন্থা নির্দ্দেশ করেছিলেন সে পথ বা পন্থা মধ্যপন্থা বা মধ্যপথ নামে পরিচিত। বুদ্ধের মতে ভোগবিলাস বা কৃচ্ছ্র সাধন এর কোনটাই মুক্তি লাভের সহায়ক নয়। এই দু'টির মধ্যপথ অনুসরণ করলেই নির্ব্বাণ লাভ করা সম্ভব হতে পারে।

বুদ্ধের ধর্ম্মমতে দার্শনিক তত্ত্বের তেমন জটিলতা নেই। ক্রিয়াকাণ্ডের উপর কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। সরল সহজ বোধ্য সাধারণ ভাষায় তিনি মানুষের মুক্তি লাভের যে পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন পঞ্চভিক্ষু গভীর মনোযোগ দিয়ে তা শুনলেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ উপলব্ধি ব্যাখ্যা করে চল্লেন— অবশেষে পঞ্চভিক্ষুর মধ্যে কৌণ্ডিণ্য নামে ভিক্ষু তাঁর মতের সারবত্তা গ্রহণ করে বুদ্ধের প্রথম শিষ্য বলে পরিচিত হলেন। তারপর দিন এবং তারও পরের দিন অপর ভিক্ষুদের সঙ্গে চললো গভীর আলোচনা—অবশেষে বাকী চার জন ভিক্ষু তাঁর শিষ্যত্ব

গ্রহণ করলেন। মৃগদাবের এই পঞ্চভিক্ষুর কাছে বুদ্ধ কর্ত্তৃক ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বৌদ্ধ সাহিত্যে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন নামে পরিচিত।

পঞ্চভিক্ষুর বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের সংবাদ সারনাথ এবং বারাণসী অঞ্চলে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃগদাবে বহু দর্শনার্থীর ভীড় হতে লাগলো।

ক্রমে দূরদূরান্তর থেকেও সত্যানুসন্ধিৎসুরা দল বেঁধে তাঁকে দেখতে আসতো। চীর পরিহিত সর্ব্বত্যাগী প্রসন্নকান্তি সেই তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর উপদেশ শুনে বহুলোক তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। শীঘ্রই নির্জ্জন মৃগদাব দর্শনার্থীদের গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠলো।

ধনী নির্ধন প্রৌঢ় যুবা নানা শ্রেণীর ব্যক্তি নিত্য বুদ্ধদেবকে দর্শন করতে আসতেন এবং তাঁর উপদেশ শুনতেন। যে পঞ্চভিক্ষু তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁরাই তাঁর একমাত্র শিষ্য ছিলেন। পরে যাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন যশ; ইনি বারাণসীর এক ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠীর পুত্র। বিলাস ব্যসনের কোনো অভাবই তাঁর ছিল না কিন্তু ক্রমাগত সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ করে তিনি যৌবনে ক্লান্ত বোধ করলেন এবং লোকমুখে বুদ্ধের কথা শুনে তাঁকে দর্শন করতে মৃগদাবে এলেন। বুদ্ধকে দেখে এবং তাঁর কথা শুনে যশ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। একমাত্র পুত্র বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে এ সংবাদ পেয়ে যশের পিতা মৃগদাবে এসে তাঁকে সংসারাশ্রমে ফিরিয়ে নেবার জন্য চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। বুদ্ধই যশের একমাত্র শরণ হয়ে রইলেন।

কিছুদিনের মধ্যে বুদ্ধের শিষ্যসংখ্যা দাঁড়ালো পঞ্চাশ। এ সময় বুদ্ধ একদিন তাঁর শিষ্যদের ডেকে বল্লেন যে তাঁরা যেন প্রত্যেকেই সাধ্যমত তাঁর বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তিনি তাঁদের একথাও বল্লেন যে, যদি কেউ তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মমত

গ্রহণ যোগ্য বলে মনে করে এবং যদি দীক্ষিত হতে চায় তাহলে তাঁরাই সেই ব্যক্তিকে দীক্ষা দান করতে পারবেন। বুদ্ধ তাঁর নিজের ব্যক্তিগত চেষ্টায় নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে তাঁর তত্ত্ব প্রচারের সুযোগ পাচ্ছিলেন—বৃহত্তর জনচিত্তে তাঁর আবেদন পৌঁছান সম্ভব ছিল না। সেইজন্য তিনি তাঁর শিষ্যদের ধর্ম্মপ্রচার এবং দীক্ষাদানের অধিকার দিয়েছিলেন।

তাঁর কথামত শিষ্যরা ভাগ হয়ে নানাদিকে বেরিয়ে পড়লেন। বর্ষাঋতু ছাড়া বছরের সব সময় তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে পর্য্যটন করে বেড়াতেন। বুদ্ধের বাণী যাঁদের মর্ম্মস্পর্শ করতো তাঁরা অনেকেই এই সব ভিক্ষুদের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতেন। যাঁরা স্বয়ং তথাগতের কাছে থেকে ধর্ম্মের বাণী শুনতে চাইতেন—তাঁরা আসতেন মৃগদাবে। বুদ্ধ শুধু শিষ্যদের প্রচার কার্য্যের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। বুদ্ধত্বলাভের পর প্রথম বর্ষা তিনি মৃগদাবেই অতিবাহিত করেছিলেন; কিন্তু বর্ষা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পর্য্যটনে বার হলেন। প্রথমে তিনি যে পথে সারনাথে এসেছিলেন, সেই পথে ফিরে গেলেন তাঁর সাধনার ক্ষেত্র উরুবিল্ব গ্রামে। যে বোধি বৃক্ষতলে তিনি সম্যক জ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই স্থানটি তাঁর কাছে পরম প্রিয়। এই খানে এসে তিনি কিছুকাল অবস্থান করলেন। এইখানেও বহু দর্শনার্থী তাঁকে দেখতে আসতেন তাঁর মুখে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনতেন। কেউ কেউ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। যাঁরা উরুবিল্বে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাশ্যপ গোত্রীয় তিন ভাই। এঁরা সকলেই পরম শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। বহুদিন ধরে নানাবিষয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে এঁদের আলোচনা হয়েছিলো কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এরা তিনজনেই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মত কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা বুদ্ধকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছেন এ সংবাদ স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু

অধিবাসী তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। অনতিকাল মধ্যে ঐ অঞ্চলে বৌদ্ধের অনুগত শিষ্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে চললো।

কিছুদিন উরুবিল্বে বাস করে বুদ্ধ রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। কপিলবাস্তু ছেড়ে তিনি প্রথম যখন রাজগৃহে এসেছিলেন তখন বিম্বিসারের কাছে তিনি এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারলে তিনি রাজগৃহে কিছুকাল অতিবাহিত করবেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য রাজগৃহে এলেন। রাজগৃহ তখন পূর্ব্ব ভারতের রাজধানী। আর্য্যাবর্ত্তে রাজগৃহের মত সমৃদ্ধ নগরী ছিল না। শুধু রাজধানী বলে নয়—ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও রাজগৃহ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার ধনী শ্রেষ্ঠীরা সমুদ্রপথে দেশদেশান্তরে বাণিজ্য করতে যেতেন, আবার বহু বিদেশী ব্যবসায়ীও এই নগরে বসবাস করতেন। স্বাধীন ধর্ম্ম চিন্তার কেন্দ্রভূমি রূপেও রাজগৃহ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে পূর্ব্ব ভারতে আরো একজন মহাপুরুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন। মহাবীর বর্দ্ধমান—যিনি জৈন ধর্ম্মের অন্যতম প্রবর্ত্তকরূপে সমসাময়িক যুগে প্রসিদ্ধি অর্জন করে ছিলেন। সুতরাং রাজগৃহের খ্যাতি বুদ্ধের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। রাজগৃহে আগমনের পশ্চাতে শুধু বিম্বিসারের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের তাগাদাই ছিল তা নয়—সেখানে ধর্ম্মপ্রচারের অভূতপূর্ব্ব সুযোগ পাওয়া যাবে, একথা জেনেই বুদ্ধ রাজগৃহে এসে ছিলেন। রাজগৃহে বুদ্ধের আগমনের সংবাদ পাওয়ামাত্র বিম্বিসার তাঁকে দর্শন করে অভ্যর্থনা জানালেন। বুদ্ধ নৃপতিকে আশীর্ব্বাদ করলেন কিন্তু তিনি রাজপ্রাসাদে থাকতে চাইলেন না, নগরের উপকণ্ঠে এক আম্র কাননে তিনি অবস্থান করতে লাগলেন।

বহু জনাকীর্ণ রাজগৃহ নগরী। বুদ্ধদেবের আগমনের সংবাদ পেয়ে দলে দলে নরনারী তাঁকে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যা দর্শন করতে আসতো। বুদ্ধও অপরিমিত উৎসাহ নিয়ে তাঁদের

কানে তাঁর অমৃতময় বাণী ঢেলে দিতেন। দর্শনার্থীরা পরমপ্রীতি ভরে উৎকর্ণ হয়ে অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে সে বাণী শ্রবণ করতেন আর এঁদের অধিকাংশই বুদ্ধের শরণাগত হয়ে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা প্রচারে উদ্যোগী হতেন। এমনিভাবে রাজগৃহকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবেদন জনসাধারণের মধ্যে ক্রমশঃ পরিব্যাপ্ত হতে লাগলো।

বিম্বিসার প্রায়ই বুদ্ধের কাছে আসতেন—বুদ্ধও তাঁকে যথোচিত উপদেশ দান করতেন। বিম্বিসারের দুঃখ যে রাজকার্য্যের জন্য তাঁকে অনেকখানি সময় দিতে হয়। তাঁর ইচ্ছা তিনি প্রত্যহ দু'বেলা বুদ্ধের কাছে আসেন—কিন্তু তা সম্ভব হয় না। বুদ্ধকে তিনি তাঁর প্রাসাদে গিয়ে থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কিন্তু বুদ্ধ তাতে সম্মত হননি। অগত্যা রাজা বিম্বিসার তাঁকে একদিন তাঁর প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। বুদ্ধ তাঁর এই অনুরোধ শুনে নিরুত্তর হয়ে রইলেন। পরে তাঁর অনুচরদের কাছ থেকে রাজা জানতে পারলেন যে বুদ্ধ মৌন সম্মতি দিয়ে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। রাজা হৃষ্ট মনে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

পরদিন শিষ্য পরিবৃত হয়ে বুদ্ধ রাজপ্রাসাদে এলেন। তখনকার প্রচলিত প্রথা অনুসারে রাজা নিমন্ত্রিতদের আহার্য্য পরিবেশন করলেন। আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বুদ্ধ যখন তাঁর বাসস্থানে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন তখন রাজা তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—নগরের উপকণ্ঠে বেণুবন নামে যে বিস্তীর্ণ রাজকীয় উদ্যান রয়েছে বুদ্ধ যদি সেটা তাঁর নিজের এবং তাঁর শিষ্যদের ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করেন তাহলে তিনি পরম অনুগৃহীত বোধ করবেন। বুদ্ধ এই স্বেচ্ছা প্রণোদিত দান গ্রহণ করতে সম্মত হলেন। রাজা সর্ব্বসমক্ষে স্বর্ণভৃঙ্গার থেকে বুদ্ধের হাতে জল ঢেলে দিয়ে বল্লেন : "ভগবান, এই বেণুবন উদ্যান আমি বুদ্ধ এবং ভিক্ষু

সঙ্ঘকে দান করছি।” সেবার এবং তারপরেও বুদ্ধ শিষ্যদের সঙ্গে বহুকাল বেণুবনে অবস্থান করেছিলেন।

রাজগৃহের নিকটে ছিল নালন্দা নামে সমৃদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে কোলিত ও উপতিষ্য নামে দু'জন ব্রাহ্মণ যুবক বাস করতেন। এঁরা দু'জনেই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এঁরা যে গুরুর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নাম সঞ্জয়। কিন্তু সঞ্জয়ের মত কৃতবিদ্য গুরু পেয়ে এবং বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও এঁরা তৃপ্ত হতে পারেননি। একবার রাজগৃহের উপকণ্ঠে ভ্রমণ করতে করতে এঁদের দু'জনের সঙ্গে বুদ্ধের এক শিষ্যের দেখা হলো। এঁর নাম অশ্বজিৎ। সারনাথে যে পঞ্চভিক্ষুর কাছে বুদ্ধ প্রথম ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেছিলেন অশ্বজিৎ তাঁদেরই একজন। অশ্বজিতের পোষাক পরিচ্ছদ আকৃতি প্রকৃতি দেখে এঁরা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। উপতিষ্যর সঙ্গে অশ্বজিতের প্রথম আলাপ হলো, তাঁর কাছে থেকে বুদ্ধ এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মমতের কথা জেনে উপতিষ্য পরিতৃপ্ত হলেন। শুষ্ক জ্ঞান চর্চ্চায় যে প্রশ্নের সমাধান হয়নি আজ বুদ্ধের বাণীতে তিনি তাঁর সন্ধান খুঁজে পেলেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তি ও আনন্দের আবহাওয়া। বন্ধু কোলিতের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হলো—তখন কোলিত তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন : “বন্ধু তুমি অমৃতলাভ করেছ ?” উপতিষ্য উত্তর দিলেন : “হ্যাঁ আমি অমৃতের সন্ধান পেয়েছি।”

উপতিষ্যের কাছে বুদ্ধ এবং তাঁর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে সব শুনে কোলিত বুদ্ধের সাক্ষাত দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন; পরে এঁরা দু'জনেই রাজগৃহের বেণুবনে গিয়ে বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাঁর অমৃতময় উপদেশ শুনে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

কোলিত ও উপতিষ্যের মত শাস্ত্রজ্ঞ বড় ব্রাহ্মণ যুবকেরা বুদ্ধের উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন এ সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের দর্শন ভিক্ষার্থীদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে

চললো। উপতিষ্য এবং কোলিত বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর তাঁদের ভূতপূর্ব্ব গুরু সঞ্জয় তাঁদের ডেকে পাঠালেন। তিনি অনেক শাস্ত্র বাক্য উদ্‌ধৃত করে তাঁদের স্বধর্ম্ম ত্যাগ করা থেকে নিবৃত্ত করতে চাইলেন কিন্তু তাঁর যুক্তি এবং প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। যাঁদের অন্তরলোক বুদ্ধের দীপ্তিতে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল তাঁদের কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা নিরর্থক বলে মনে হলো।

কোলিত আর উপতিষ্য দীক্ষা গ্রহণের পর নালান্দা ছেড়ে বসবাস করতে লাগলেন। প্রায় সারাক্ষণ তারা বুদ্ধের সান্নিধ্যে থাকতেন, তাঁর উপদেশ শুনতেন। বুদ্ধ এঁদের পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা এবং চরিত্র মাধুর্য্যের পরিচয় পেয়ে খুব স্নেহ করতেন এবং এঁদের দু'জনকে তাঁর প্রধানতম শিষ্য বলে পরিচয় দিতেন। যাঁরা বয়সে আরো প্রবীণ ছিলেন এবং আরো আগে বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এ দু'টি যুবকের প্রভাব দেখে ঈর্ষ্যা বোধ করতেন। কিন্তু বুদ্ধ সৎ উপদেশ দিয়ে তাঁদের ঈর্ষ্যা দূর করে দিয়েছিলেন। পরবর্ত্তীকালে এঁরা দু'জন বুদ্ধের প্রধানতম শিষ্য বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। উপতিষ্যের মায়ের নাম ছিল রূপসারি। এঁর জন্য উপতিষ্য সারিপুত্র নামে পরিচিত হলেন, আর গোত্র নাম অনুসারে কোলিত পরিচিত হলেন মৌদগল্যায়ন নামে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাসে বুদ্ধের পরেই এই দু'টি নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। দেশদেশান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এদের দু'জনের মত অক্লান্ত চেষ্টা আর কেউ করেননি। শাস্ত্রে এঁদের যেমন ছিল গভীর জ্ঞান তেমনি এঁদের অন্তরে ছিল অবিচলিত নিষ্ঠা। এঁরা এঁদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য অকাতরে নিয়োগ করেছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য। এঁদের পূত চরিত্রে প্রভাবিত হয়ে এবং এঁদের কণ্ঠে উচ্চারিত বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে বহু নরনারী বুদ্ধের শরণ নিয়েছিল।

রাজা বিম্বিসারের আগ্রহাতিশয্যে বুদ্ধ পর পর তিন বর্ষা

রাজগৃহে অতিবাহিত করলেন। বর্ষাকালই একমাত্র বিশ্রামকাল। এই সময় পথপ্রান্তর দুর্গম হয়ে ওঠে। একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়া অত্যন্ত বিপদজনক হয়, তাই এই সময়টা বুদ্ধদেব পর্য্যটনে বার না হয়ে একই জায়গায় থাকতেন।

এই তিন বছরে তাঁর খ্যাতি আর্য্যাবর্ত্তের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কপিলবাস্তুতেও সর্ব্বত্র তাঁর কথা আলোচিত হতো। সিদ্ধার্থ যেদিন গৃহ ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছিলেন সেদিন শুদ্ধোদন মনে যে শূন্যতা বোধ করেছিলেন সে শূন্যতা আজো পূর্ণ হয়নি। তারপর সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন, তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন—এসব খবরই শুদ্ধোদনের কানে এসেছে। পুত্রের গৌরবে পিতার পক্ষে গৌরব বোধ করা স্বাভাবিক, কিন্তু তবু শুদ্ধোদন একান্তে বসে প্রায়ই পুত্রের কথা ভাবতেন। একটি বারের জন্য হলেও পুত্রকে দেখতে পেলে তাঁর অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা মিটবে একথাও তাঁর মনে হতো। রাজকার্য্য এখন আর তাঁর ভালো লাগে না, দৈহিক শক্তিও তাঁর ক্রমশঃ কমে আসছে। একদিন তাঁর অন্তরের ইচ্ছা তিনি তাঁর এক অন্তরঙ্গ অনুচরের কাছে প্রকাশ করলেন।

বুদ্ধ তখন রাজগৃহে। একদিন কপিলবাস্তু থেকে এক অনুচর এসে তাঁকে সেখানকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানালো। কিন্তু বুদ্ধ সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। তারপরেও আরো দু'বার কপিলবাস্তু থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল, কিন্তু আগের মতই বুদ্ধ সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছিলেন। অনুচর গিয়ে যখন শুদ্ধোদনকে এই প্রত্যাখানের সংবাদ জানালো তখন শুদ্ধোদনের চোখে মুখে হতাশার ভাব ফুটে উঠেছিল। তাঁর মনে হলো তাঁর আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই থাকবে। পুত্রমুখ দর্শন তাঁর ভাগ্যে নেই। শুদ্ধোদনের এই আশা ভঙ্গের সংবাদ রাজধানীতে প্রচারিত হলো। প্রজারা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতো। শুদ্ধোদনের শেষ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত

হবে না এই চিন্তা তাদের কাছে অসহ্য বলে মনে হলো। শেষ পর্য্যন্ত শুদ্ধোদনের জনকয়েক হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বললেন—আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখা যাক, যদি রাজার আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয়। শুধু শুদ্ধোদনই বা কেন, মাতা প্রজাবতী এবং রাহুলমাতা গোপা—এঁরাও বুদ্ধকে দর্শন করার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন—তাছাড়া কপিলবাস্তুর সাধারণ নরনারীর আগ্রহও কম নয়। যাকে পেয়ে উরুবিল্ব, শ্রাবস্তী, সারনাথ, রাজগৃহ ধন্য হয়েছিল, যাঁর উপদেশ-বাণী বহু নরনারীর প্রাণে শান্তি এনে দিয়েছিল সেই করুণাময় তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখবার জন্য কপিলবাস্তুর জনসাধারণ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধের কাছে আবার অনুচর পাঠান হবে জেনে তাঁরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

এইবার যার উপর আমন্ত্রণ জানাবার ভার দেওয়া হয়েছিল তার নাম কালুদায়ী। ইনি সিদ্ধার্থের বাল্যকালের বন্ধু। একসঙ্গে খেলাধূলা করেছিলেন। এই তু'জনের মধ্যে এককালে যথেষ্ট অন্তরঙ্গতাও ছিল, তাই কালুদায়ীর উপরেই এই গুরুভার অর্পণ করা হলো। সকলের আন্তরিক শুভেচ্ছা নিয়ে কালুদায়ী একদিন যাত্রা করলেন রাজগৃহের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘপথ পরিক্রম করে কালুদায়ী মগধের রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধদেব শিষ্যদের নিয়ে তখন বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। কালুদায়ী যখন সেখানে উপস্থিত হলেন তখন বহু দর্শনার্থী বুদ্ধের চারপাশ ঘিরে উপবিষ্ট। বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখে কালুদায়ী অভিভূত হয়ে পড়লেন। বারে বারে তাঁর মনে হতে লাগলো একি সেই সিদ্ধার্থ যাঁর সঙ্গে কতদিন একসঙ্গে খেলাধূলা করেছেন, কোনও সঙ্কোচ বোধ না করে দীর্ঘকাল মেলামেশা করেছেন! রাজপুত্র বলে যাকে লোকে সম্ভ্রম করেছে—তাঁর আজ একি অভাবনীয় বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন। কালুদায়ী পরম বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে ভাবছিলেন কি সেই তুর্নিবার শক্তি যার আকর্ষণে তরুণ বয়সে গৃহ পরিজন ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। আজ

রাজবেশের পরিবর্ত্তে তাঁর অঙ্গের শোভা ভিক্ষুক চীর বস্ত্র। কিন্তু তাতেই কি অপূর্ব্ব দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে তাঁর কান্তি। তাঁর মুণ্ডিত মস্তক, তাঁর চক্ষু ঈষৎ নিমীলিত। তাঁর কণ্ঠে ভাবাবেগের উচ্ছ্বাস, মুখে অপূর্ব্ব প্রসন্নতা। কালুদায়ী জনতার একপাশে দাঁড়িয়ে একাগ্রচিত্তে তাঁর বাণী শুনছিলেন। কি প্রেমময় সে বাণী, তাঁর প্রতিটি কথায় যেন অমৃত ঝরে পড়ছিল। শ্রোতার দল উৎকর্ণ হয়ে সে বাণী শুনছিল। তারপর বুদ্ধের কথা শেষ হলো— শ্রোতারা এক একজন করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করে গেল। শুধু গেলেন না একজন– তিনি কালুদায়ী। বুদ্ধের দৃষ্টি তার উপর পড়লো, মুহূর্ত্তেই তিনি তাঁর বাল্য বন্ধুকে চিনতে পারলেন। তিনি তাঁকে আহ্বান করলেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে দুই বন্ধুতে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হলো। কালুদায়ী তার আগমনের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একটি কথাও বললেন না। তিনি শুধু দিন কয়েক বেণুবনে থাকবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ সানন্দে অনুমতি দান করলেন। প্রতিদিন প্রার্থনার সময়ে অন্যান্য শিষ্যের সঙ্গে কালুদায়ী নিয়মিত-ভাবে উপস্থিত থাকতেন। অপরাহ্নে দর্শনার্থীর যখন ভীড় করে আসতো তখন কালুদায়ী সেখানে উপস্থিত থাকতেন। দিন কয়েক অতিক্রান্ত হবার পর কালুদায়ী একদিন বুদ্ধকে একান্তে পেয়ে কপিলবাস্তু সম্বন্ধে আলাপ আরম্ভ করলেন। তিনি সোজাসুজি যদি তাঁকে কপিলবাস্তু যাবার আমন্ত্রণ জানান তাহলে সে অনুরোধ হয়তো রক্ষিত হবে না। তাই সে সোজাসুজি আমন্ত্রণ না জানিয়ে কপিলবাস্তুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। সিদ্ধার্থ ফুল ভালবাসতেন তা কালুদায়ী জানতেন। কালুদায়ী মনে করলেন ফুল সম্বন্ধে যে দূর্ব্বলতা তা এখনও তাঁর আছে তাই তিনি কপিলবাস্তু থেকে রাজগৃহে আসবার পথে যে সব বিচিত্র ধরণের ফুল দেখেছেন তার বর্ণনা দিতে লাগলেন। পাহাড় যেখানে শেষ হয়ে সমতল ভূমি

আরম্ভ হয়েছে তার গায়ে অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে। মখমলের মত নরম সবুজ ঘাস আর তারই ফাঁকে ফাঁকে লাল নীল প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের ফুলের সমারোহ। তাঁর কথা শুনতে শুনতে বুদ্ধের চোখের সামনে ভেসে উঠলো কপিলবাস্তুর প্রায় ভুলে যাওয়া ছবি। কত স্মৃতি একের পর এক ভীড় করে তাঁর মনে আসতে লাগলো। কালুদায়ী সেই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে কপিলবাস্তুতে যাবার কথা বলতেই নিজের অজ্ঞাতেই বুদ্ধ সম্মতি দিলেন।

কালুদায়ীর প্রতীক্ষা সার্থক হলো। বুদ্ধের সম্মতি নিয়ে সে কপিলবাস্তুতে সংবাদ দেবার জন্য ফিরে গেল। তার কাছে বুদ্ধের সম্মতির কথা জেনে শুদ্ধোদন থেকে রাজ্যের দীনতম প্রজা পর্য্যন্ত উল্লসিত হয়ে উঠলেন। সারা রাজ্যে আনন্দের স্রোত বয়ে যেতে লাগলো।

বুদ্ধদেব সম্মতি দিয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর সর্ত্ত ছিল যে রাজ-প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করবেন না, বা রাজধানীতে অবস্থান করবেন না। সেই জন্য তাঁকে রাজধানীর বাইরে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিরাট মণ্ডপ তৈরী হলো। ন্যগ্রোধ-আরাম নামে একটি উদ্যানে বুদ্ধ এবং তার শিষ্যদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হলো। অবশেষে যেদিন সেই বহু বাঞ্ছিত দিনটি এলো সেদিন রাজধানীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা মালা চন্দন পুষ্প গন্ধ দ্রব্য নিয়ে শোভাযাত্রা করে তাদের সম্মানিত অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অগ্রসর হলো। শোভাযাত্রার প্রথমে বালক বালিকার দল তারপর অভিজাত বংশের কিশোর-কিশোরী, আর সবার শেষে রাজবংশের প্রতিনিধিরা ছিলেন।

সেদিন কপিলবাস্তু উৎসব মুখর হয়ে উঠেছিল। সেই ছ'বছর আগে তাদের যুবরাজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছিলেন। সেই থেকে রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন হয়নি। আজ যুবরাজ ভিক্ষুর বেশে ফিরে আসছেন। তাঁরই

অভ্যর্থনার জন্য নগরের প্রতিটি গৃহ পুষ্পপল্লবে সজ্জিত করা হয়েছে। পথে পথে সুদৃশ্য তোরণ। নগরের উপকণ্ঠে উৎসব বেশে সজ্জিত আগ্রহ আকুল জনতা। শুদ্ধোদন স্বয়ং এ জনতার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

দূর থেকে সশিষ্য বুদ্ধকে আসতে দেখে শোভাযাত্রাকারী জনতার মধ্যে দেখা গেল অপূর্ব্ব উন্মাদনা। সকলেই তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য অধীর হয়ে উঠলো।

চীরবাস পরিহিত, মুণ্ডিত মস্তক, শুভ্রকান্তি সন্ন্যাসীকে আসতে দেখা গেল, তাঁর পিছনে তাঁর শরণাগত অসংখ্য ভিক্ষুর দল। যুবরাজ বলে তাঁকে আর চিনবার উপায় নেই। তাঁকে দেখা-মাত্র সবার মনেই একটা শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠলো। যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, যাঁরা ছেলেবেলায় তাঁকে দেখেছেন তাঁরা পর্য্যন্ত তাঁর দিব্যকান্তি দেখে শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। শুদ্ধোদন নগর-বাসীর পক্ষ থেকে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠকে অভ্যর্থনা জানালেন। দীর্ঘ ছ'বৎসর পরে প্রিয় পুত্রকে তিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন অথচ রাজকীয় গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে প্রজা সাধারণের প্রতিনিধি হয়ে দূর থেকে অভিনন্দন জানানোর বেশী কিছু করা সম্ভব হয়নি। পুত্রের প্রতি সহজাত স্নেহ তাঁকে অদৃশ্য বন্ধনে পুত্রের সঙ্গে অভিন্ন করে তুলতে চাইছিল কিন্তু রাজকীয় মর্য্যাদাবোধ তাঁর সে আন্তরিক ইচ্ছাকে পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াল। যাঁরা শুদ্ধোদনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন তাঁরা তাঁর মনের পরস্পর বিরোধী ভাবের কথা উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু শুদ্ধোদনের হৃদয়ে যত আলোড়নের সৃষ্টিই হয়ে থাকনা কেন, তাঁর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্রের মনে নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য ছাড়া আর কোনো ভাব লক্ষ্য করা গেল না।

অভ্যর্থনা জানাবার পর—পূর্ব্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা অনুযায়ী বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ন্যগ্রোধ আরামে বিশ্রামের জন্য গেলেন। নাগরিকরা নিজ নিজ গৃহে ফিরে গেলেন।

বুদ্ধ রাজধানীতে অবস্থান করবেন না তাই তাঁর জন্য নগরীর উপকণ্ঠে স্থান নির্ব্বাচিত হয়েছিল। পরদিন যথারীতি বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যেরা নগরে প্রবেশ করলেন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ভিক্ষাপাত্র। নগরের প্রতি গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাঁরা ঘুরতে লাগলেন। যার যা সাধ্য সে তাই নিঃশেষে দান করে ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে দিল। বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাঁর বাসস্থানে ফিরে আসতে উদ্যত—এমন সময় শুদ্ধোদনের এক অনুচর তাঁর কাছে এসে "রাজা তাঁর দর্শনপ্রার্থী" এই অনুরোধ জানালেন। রাজার আদেশ অলঙ্ঘনীয়, তাই বুদ্ধ রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। সেই প্রাসাদ! যেখানে তাঁর জীবনের উনত্রিশটি বছর অতিবাহিত হয়েছে। যে প্রাসাদ থেকে একদিন তিনি মহাভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধ প্রাসাদের দ্বার দেশে গিয়ে থেমে গেলেন। অভ্যন্তরে যেতে তিনি প্রস্তুত নন। সংবাদ পেয়ে শুদ্ধোদন নিজে দেখা করতে ছুটে এলেন। পুত্র ভিক্ষা পাত্র হাতে নগর পরিক্রম করবে এটা তাঁর কাছে বিসদৃশ বলে মনে হলো। তিনি অনুরোধ করলেন যে, যে ক'দিন তাঁরা কপিলবাস্তুতে অবস্থান করবেন সে ক'দিন যেন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যরা ভিক্ষা বৃত্তি ত্যাগ করে রাজপ্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করেন। ভিক্ষাবৃত্তি রাজবংশে জাত পুত্রের অনুচিত ধর্ম্ম—এই কথাই শুদ্ধোদন পুত্রকে বোঝাতে চাইলেন। বুদ্ধ তার উত্তরে বল্লেন যে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করে থাকলেও তাঁর পরিচয় রাজবংশ দিয়ে নির্দ্ধারণ করা উচিত নয়—তিনি 'বুদ্ধ' এই তাঁর একমাত্র পরিচয়। যাঁরা স্বেচ্ছায় দান করবেন সেই দান গ্রহণ করা তিনি কর্ত্তব্য বলে মনে করেন এবং তাঁর কাছে ভিক্ষা বৃত্তিও দোষণীয় নয়। তবু তিনি শুদ্ধোদনের অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন। সেদিন থেকে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা রাজপ্রাসাদেই আহার্য্য গ্রহণ করতে লাগলেন।

বহিঃপ্রাসাদে যখন শুদ্ধোদন রাজপুত্রের সঙ্গে আলোচনা

করছিলেন তখন অন্তঃপুরেও বুদ্ধের আগমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। মহাপ্রজাবতী দীর্ঘকাল পুত্রের অদর্শনের পর ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলেন। রাজার সঙ্গে যতক্ষণ কথা হচ্ছিল তিনি এবং অন্যান্য অন্তঃপুরিকারা অন্তরাল থেকে পিতাপুত্রের উত্তর প্রতি-উত্তর শুনছিলেন। তাঁদের আলোচনা শেষ হয়ে গেলে বুদ্ধ যখন স্থানত্যাগে উদ্যত তখন অন্তঃপুরের পরিচারিকা তাঁর কাছে এসে নিবেদন করলে ঃ "মাতা প্রজাবতী তাঁর দর্শনপ্রার্থী।" মুহূর্ত্তের মধ্যে বুদ্ধের মুখে চোখে ইতস্ততঃ ভাব দেখা গেল। পরক্ষণে তিনি সম্মতি প্রকাশ করলেন। পরিচারিকা-প্রদর্শিত-পথে বহু কক্ষ অতিক্রম করে তিনি মাতা প্রজাবতীর কক্ষে উপস্থিত হলেন। দীর্ঘকাল অদর্শনের পর দু'জন দু'জনকে দেখলেন। কিন্তু তাঁদের এ মিলনকে মাতাপুত্রের মিলন বলা যায় না। অনেকখানি সংযম আর দূরত্ব বজায় রেখে তাঁরা দু'জন দু'জনের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য আলাপ আলোচনা করলেন। প্রজাবতীর অনুরোধে বুদ্ধ সেদিন রাজ-অন্তঃপুরে আহার গ্রহণ করলেন। প্রজাবতীর কক্ষে যখন অবস্থান করছিলেন তখন অন্তঃপুরিকারা সকলে কেউ দূর থেকে কেউ কাছে এসে তাঁকে দর্শন করে গেলেন। শুধু এলেন না একজন—তিনি রাহুল মাতা—গোপা।

আহারান্তে বুদ্ধ যখন অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় ব্যস্ত তখন পুরনারীরা রাহুলমাতাকে বল্লেন ঃ 'সকলে গিয়ে বুদ্ধ দর্শন করছে আর তুমি এখানে ঘরে বসে আছ কেন?' উত্তরে রাহুলমাতা বল্লেন ঃ 'আমার যদি কোনো মূল্য থাকে তবে উনি নিজেই আমার কাছে আসবেন।' এই কথা যখন বুদ্ধের কানে গেল তখন বুদ্ধ তাঁর প্রিয়তম শিষ্য সারিপুত্র আর মৌদ্‌গল্যায়নকে সঙ্গে নিয়ে রাহুলমাতার কক্ষে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধকে দেখে রাহুলমাতা প্রথমে এসে ভুলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করলেন —কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাঁর সঙ্গী শিষ্য দু'জনকে দেখে দূরে সরে গিয়ে

অবগুণ্ঠনের তলায় আত্মগোপন করলেন। একটু পরে সে কক্ষে শুদ্ধোদন প্রবেশ করলেন। তিনি পুত্রকে জানালেন যে তাঁর গৃহত্যাগের পর থেকে রাহুলমাতা দিনে একবারের বেশী খাদ্য গ্রহণ করেন না, ভূমিতল ভিন্ন শয্যাগ্রহণ করেন না, আর তাঁর সুদীর্ঘ ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাশি তিনি আপন হাতে ছেদন করেছেন। সর্ব্বপ্রকার ভোগবিলাস থেকে তিনি নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন।

বুদ্ধ সেই কক্ষে বেশীক্ষণ অবস্থান করেননি। রাহুলমাতার কাছে বিদায় নিয়ে তিনি ন্যগ্রোধ আরামে ফিরে এলেন।

কপিলবাস্তুতে প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা বুদ্ধের উপদেশ শুনবার জন্য বহু নরনারী সমবেত হতো। বুদ্ধ তাঁদের কানে তাঁর ধর্ম্মের সরল বাণী ঢেলে দিতেন। যাঁরা তাঁর কথা শুনতো তাঁদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। যাঁরা এই সময় বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য নন্দ। ইনি মহাপ্রজাবতীর পুত্র। বুদ্ধের গৃহত্যাগের পর ইনি পিতামাতার অত্যধিক প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। এই সময় তিনি যৌবনে পদার্পণ করেছেন এবং শুদ্ধোদন ও প্রজাবতীর আন্তরিক অভিপ্রায় অনুসারে নন্দ গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। ন্যগ্রোধ আরামে প্রতিদিন যে সব শ্রোতা ও দর্শনার্থী সমবেত হতেন, তাঁদের মধ্যে নন্দও ছিলেন একজন। বুদ্ধদেবকে তাঁর খুব ভালো লাগতো, তাঁর কথাবার্ত্তা তিনি মন দিয়ে শুনতেন। বুদ্ধ যখন নগর পরিক্রমায় বার হতেন নন্দকেও অনেক সময় তাঁর সঙ্গে দেখা যেত। একদিন বুদ্ধ নগর ভ্রমণে বার হয়েছেন, সঙ্গে দু'চারজন শিষ্য, তাঁদের পিছনে নন্দ। বুদ্ধের হাতে ভিক্ষাপাত্র। কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর বুদ্ধ ভিক্ষাপাত্রটি নন্দের দিকে এগিয়ে ধরলেন আর নন্দ পাত্রটি নিজ হাতে তুলে নিলেন—তারপর দ্বার থেকে দ্বারান্তরে তাঁরা পরিভ্রমণ করতে লাগলেন। নন্দর হাতে

ভিক্ষাপাত্র রয়ে গেল। পরিক্রমা শেষ হ'লে সকলে ন্যগ্রোধ আরামে তাঁদের বাসস্থানের দিকে রওনা হলেন। প্রকাশ্য রাজপথ দিয়ে বুদ্ধ আর তাঁর শিষ্যরা যখন ন্যগ্রোধ বনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন রাজপথের দু'ধারে যে সব বাসগৃহ ছিল সেইসব গৃহ থেকে অন্তঃপুরিকারা বিপুল শ্রদ্ধায় শোভাযাত্রাকারীদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। পিতামাতার ইচ্ছা অনুযায়ী নন্দের সঙ্গে কপিলবাস্তুর অভিজাত বংশীয়া যে কুমারীর বিবাহের কথা হয়েছিল—তাঁর চোখেও ভিক্ষাপাত্র হাতে নন্দর পথ পরিক্রমার দৃশ্য পড়েছিল। সে দৃশ্য তাঁর পক্ষে মর্ম্মান্তিক হয়েছিল। এ কি নন্দের সংসার ত্যাগের পূর্ব্বাভাস? এদিকে নন্দও ভিক্ষাপাত্র বর্জ্জনের কথা চিন্তা করতে পারছেন না। যে পাত্র বুদ্ধ স্বয়ং নিজহাতে তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন সে পাত্র ত্যাগ করা তাঁর সাধ্য কি? নন্দ ভাবছিলেন বুদ্ধই পাত্রটি আবার তাঁর হাত থেকে ফিরিয়ে নেবেন অথবা অন্য কোনো অনুচর পাত্রটি গ্রহণ করবেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে বুদ্ধ একেবারেই নির্ব্বিকার। তাঁর অনুচররাও কেউ ভিক্ষাপাত্র নিতে অগ্রসর হলেন না। অগত্যা নন্দ রাজধানী পরিভ্রমণ শেষ করে ভিক্ষাপাত্র হাতে ন্যগ্রোধ বনে উপস্থিত হলেন। ইতিমধ্যে ভিক্ষাপাত্র হস্তে নন্দর নগর পরিভ্রমণের কথা নগরের সর্ব্বত্র প্রচারিত হলো। শুদ্ধোদন-প্রজাবতীর কাছেও সংবাদটি গোপন রইলো না। বুদ্ধ সংসার ত্যাগ করে তাঁদের মনে যে আঘাত দিয়েছিলেন নন্দকে সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করে তাঁরা সেই আঘাতের জ্বালা জুড়োতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে অভিপ্রায় বিফল হতে চললো। এদিকে নন্দ যখন ন্যগ্রোধ বনে উপস্থিত হলেন—তখন বুদ্ধ তাঁকে সঙ্ঘে যোগদান করার নির্দ্দেশ দিলেন। সে নির্দ্দেশ অমান্য করার সাধ্য ছিল না নন্দর। তিনি অগ্রজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সংসারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করলেন।

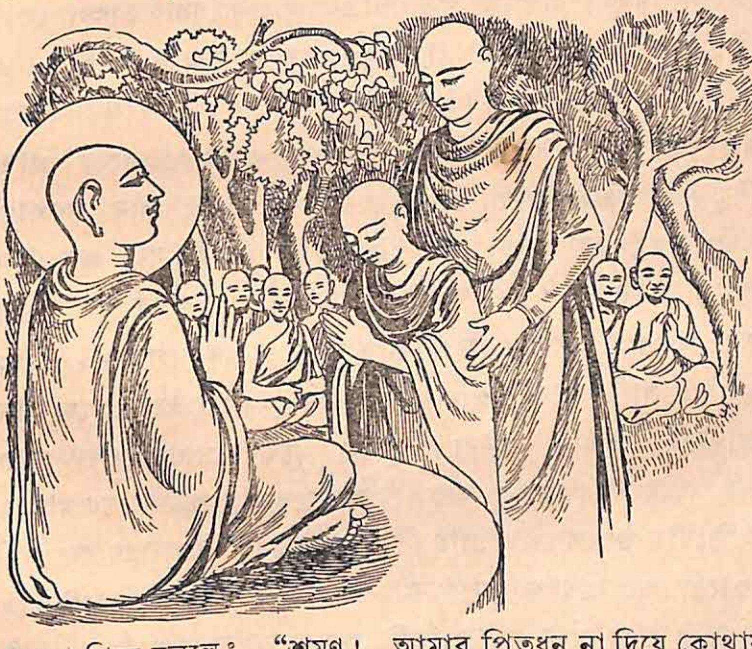
রাজপরিবার থেকে যাঁরা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে নন্দ প্রথম হলেও শেষ নন। আর যাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে তাঁর পিতৃব্য পুত্র দেবদত্ত এবং আনন্দ উল্লেখযোগ্য। আনন্দ পরবর্তীকালে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ শিষ্য বলে কীর্ত্তিত হয়েছিলেন।

শুধু রাজপরিবারের লোকেরা বা অভিজাত বংশীয়রাই বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তা নয়—তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকেরাও তাঁর উপদেশ এবং চরিত্রের প্রভাবে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উপালির নাম উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধ যখন কপিলবাস্তু থেকে রাজগৃহে ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যে অনুপ্রিয় গ্রামে দু'চার দিনের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। মহাভিনিষ্ক্রমণের পর তিনি এই অনুপ্রিয় গ্রামে প্রথম অবস্থান করেছিলেন। আজ রাজগৃহের পথে ফিরে আসতে তাঁর পূর্ব্ব স্মৃতি জেগে উঠেছিল; তাই এইখানেই তিনি দু'দণ্ড বিশ্রামের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখানে কপিলবাস্তুর অভিজাত বংশীয় কয়েকটি যুবক তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তাঁরা কপিলবাস্তুতে থাকতেই তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণের অভিলাষী হয়েছিলেন। কিন্তু গুরুজন এবং অভিভাবকদের ভয়ে তাঁদের অভিলাষ চরিতার্থ করতে পারেননি। কিন্তু আজ আর তাঁদের নিবৃত্ত করা গেল না। তাঁরা উপালি নামে তাঁদের এক অনুচরকে সঙ্গে করে কপিলবাস্তু ছেড়ে অনুপ্রিয় গ্রামে উপস্থিত হয়েছেন—ভগবান বুদ্ধের শরণাগত হবেন। তাঁদের পরিধানে বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও মূল্যবান অলঙ্কার। এই বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করে বুদ্ধের সমীপস্থ হওয়া অশোভন হবে ভেবে তাঁরা অনুচর উপালির হাতে পরিচ্ছদ এবং আভরণ তুলে দিলেন। তাঁরা উপালিকে বললেন, এইসব দ্রব্যাদি কপিলবাস্তুতে তাঁদের গৃহে যেন পৌঁছে দেওয়া হয়। উপালি

সেই সব আভরণাদি নিয়ে কপিলবাস্তুর পথে রওনা হলো, কিন্তু খানিক দূর গিয়ে তার মনে হলো যে শুধু অলঙ্কারগুলো ফিরিয়ে নিয়ে গেলে তাঁদের অভিভাবকরা ভাববেন, নিশ্চয় কুমারদের কোনো বিপদ হয়েছে, তাঁরা জীবিত নেই; এবং তাঁদের সন্দেহ এসে পড়বে উপালির উপর। সুতরাং এ জিনিসগুলি নিয়ে যাওয়া বিপদজনক। তাই সে পরিচ্ছদ আর অলঙ্কারগুলো একটা পুঁটুলী বেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখলো, তারপর ছুটে এসে বুদ্ধের কাছে নিবেদন করলো তার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। সে আর কপিলবাস্তুতে ফিরে যাবে না, বুদ্ধের মন্ত্রে দীক্ষিত হবে সে। বুদ্ধ তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করলেন। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শাক্য কুমারগণ—তাঁরাও দীক্ষা প্রার্থী, কিন্তু সবার আগে বুদ্ধ উপালিকে স্নান করে আসবার নির্দ্দেশ দিলেন এবং স্নান করে ফিরে এসে উপালি প্রথম দীক্ষা লাভের গৌরব অর্জ্জন করলেন। উপালি তথা-কথিত নিম্নজাতি—নাপিত, কিন্তু বুদ্ধ তাকে দীক্ষা দিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করলেন না। শুধু উপালি নয়, এমনি তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের বহুলোক বুদ্ধের শরণাগত হয়ে নতুন ভাবে জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

কপিলবাস্তুতে বুদ্ধদেব যাঁদের দীক্ষাদান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরো একজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য; ইনি বুদ্ধপুত্র স্বয়ং রাহুল। বুদ্ধ যে ক'দিন কপিলবাস্তুতে অবস্থান করেছিলেন সে ক'দিন তিনি শুদ্ধোদনের গৃহে আহার্য্যের জন্য আতিথ্য গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি আহার্য্য গ্রহণের জন্য আসছেন—এমন সময় রাহুলমাতা তাঁর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে পুত্রকে বললেন: "রাহুল! ইনি তোমার পিতা, এঁর কাছে থেকে তোমার পিতৃধন সংগ্রহ করে নাও।" রাহুল শুদ্ধোদনকে পিতা বলে জানতো, এইবার এই নবীন সন্ন্যাসী তার পিতা জেনে সে বিস্মিত হলো। বুদ্ধ আহারান্তে যখন প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে উদ্যত হয়েছেন

তখন মাতার ইচ্ছা অনুযায়ী রাহুল তাঁর কাছে এসে পিতৃধন দাবী করলো। সাত বছরের ছেলে পিতৃধন বলতে কি বুঝলো সেই জানে। কিন্তু মার কথা তাকে মানতে হবে, তাই সে সোজাসুজি পিতৃধন দাবী করলো। বুদ্ধের সুন্দর চেহারা ও কথাবার্ত্তা তার খুব ভালো লাগলো। দু'জনে অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো, তারপর বুদ্ধদেব যথারীতি আহার্য্য গ্রহণ করলেন। আহারান্তে যখন তিনি প্রাসাদ থেকে বাসস্থানে যাবার উদ্যোগ করছেন, তখন রাহুল তার পথ আগলে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ আগে সে কি চাইছিল সে কথা হয়তো তিনি ভুলে গিয়েছিলেন, কিন্তু রাহুল ভোলেনি। সে বুদ্ধের



সম্মুখে গিয়ে বললেঃ "শ্রমণ! আমার পিতৃধন না দিয়ে কোথায় যাচ্ছ?" বুদ্ধ নিরুত্তর রইলেন—তারপর যখন তিনি ন্যগ্রোধ আরামে যাবার জন্য রাজপথে বার হলেন, তখন রাহুল তাঁর পিছন পিছন চললো। বুদ্ধ কোনো কথা না বলে সোজা চলতে লাগলেন। দু'জনে গিয়ে যখন বাসস্থানে পৌঁছলেন তখন সারিপুত্র বুদ্ধের সঙ্গে এই

বালকটিকে দেখে বিস্মিত হলেন। তাঁকে আরো বিস্মিত করে বুদ্ধ বললেন ঃ "সারিপুত্র, রাহুল আমার কাছে তার পিতৃধন চাইছে, তাই আমি তাকে শ্রেষ্ঠ ধন দেবো। একে দীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করো।" সারিপুত্রের কাছে রাহুল দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

বালক রাহুলকে চীরবাস পরিয়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র তুলে দেওয়া হলো। এই দৃশ্য যাঁরা দেখলেন, ক্ষণকালের জন্য তাঁরা অভিভূত হয়েছিলেন—কেবল অনড় অটল রইলেন বুদ্ধদেব।

রাহুলের দীক্ষাগ্রহণ সংবাদ চারদিকে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। এমনিতে বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুতে আসবার পর থেকে সেখানকার অধিবাসীদের গতানুগতিক জীবনে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল। বহু নরনারী তাঁদের পিতৃপুরুষের ধর্ম্ম ও আচারনীতি ত্যাগ করে বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিল। এইজন্য যাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা বলে নিজেদের মনে করতেন তাঁরা বুদ্ধদেবের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এইবার তাঁরা সুযোগ পেলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাহুল—যার বিচার বুদ্ধির কোনো ক্ষমতাই নেই, শুধু তাঁর কথার উপর নির্ভর করে তাকে দীক্ষাদান এঁদের কাছে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে মনে হলো। শুদ্ধোদনও মনঃকষ্ট পেলেন। তাঁর মনে হলো ধর্ম্ম ও ন্যায়-নীতির রক্ষক রূপে এর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ জানান কর্ত্তব্য। তিনি বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করে এই সম্বন্ধে তাঁর মতামত অকপটে জানালেন। বুদ্ধ নীরবে রাজার অভিযোগ শুনলেন ; তারপর তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে অতঃপর কোনো অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে তার অভিভাবক বা মাতাপিতার অনুমতি ভিন্ন দীক্ষা দান তিনি অনুমোদন করবেন না। এই প্রতিশ্রুতিতে শুদ্ধোদন কিছুমাত্র সান্ত্বনা পেয়েছিলেন বলে মনে হলো না। ছ'বছর আগে তাঁর পুত্রের গৃহত্যাগ উপলক্ষে তিনি অন্তরে যে অসহনীয় বেদনা অনুভব করেছিলেন, আজ নতুন করে সেই অনুভূতি তাঁর মনে জেগে উঠলো। রাহুলের দীক্ষাগ্রহণে

তিনি যত উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন নন্দের দীক্ষা গ্রহণেও ততটা বিচলিত হননি। সিদ্ধার্থ, নন্দ, রাহুল একে একে সবাই পার্থিব জীবনে সুখভোগের আশা জলাঞ্জলি দিয়ে অপার্থিব রাজ্যের আনন্দ-লোকের সন্ধানী হলেন—এই পরিণতি শুদ্ধোদনের মত সংসারী লোকের কাছে স্বভাবতই দুঃখকর।

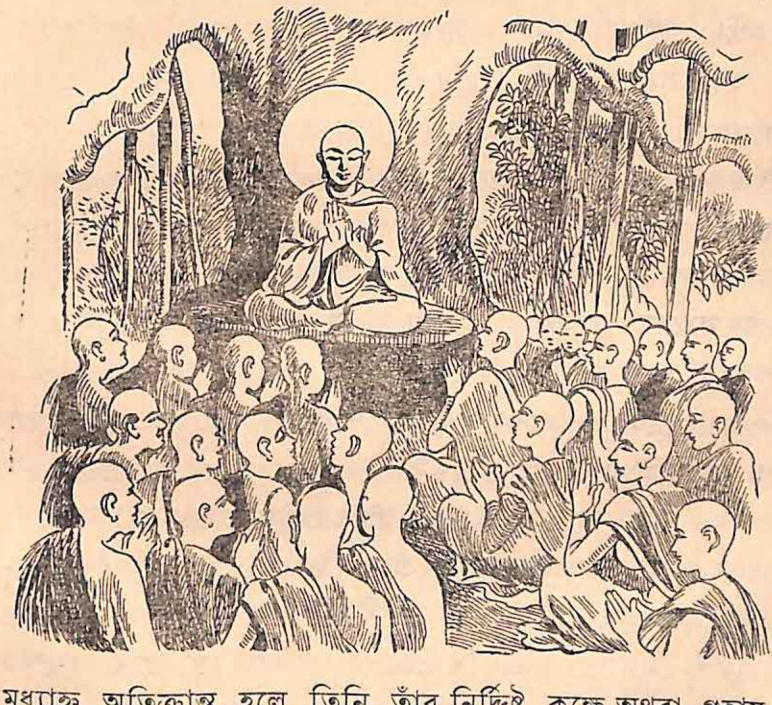
বুদ্ধ যেদিন কপিলবাস্তু ছেড়ে এলেন সেদিন আরো একটি মর্ম্মস্পর্শী ঘটনা ঘটেছিল। বুদ্ধ কপিলবাস্তু ত্যাগ করে সেদিন রাজগৃহের পথে যাত্রা করবেন—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়া মাত্র কপিলবাস্তুর প্রতিটি গৃহ শূন্য করে অসংখ্য নরনারী তাঁকে শেষবারের মত দর্শন করার উদ্দেশ্যে ন্যগ্রোধ আরামের দিকে অগ্রসর হলো। এই দর্শনপ্রার্থীদের মধ্যে কেউ বাদ গেল না। বার্দ্ধক্যের ভারে যাঁদের দেহ অক্ষম ও বিকলপ্রায় তাঁরাও শারীরিক কষ্ট অগ্রাহ্য করে বুদ্ধ দর্শনে এসেছেন। কপিলবাস্তুর রাজ-অন্তঃপুরের সকলেই ন্যগ্রোধ আরামে চলেছেন। তাঁদের অঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার, পরিধানে মূল্যবান বস্ত্র। কিছুদূর যাবার পর তাঁদের মনে হলো যে যাঁকে দর্শন করতে তাঁরা যাচ্ছেন তিনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ঐরকম বেশভূষার প্রাচুর্য্য নিয়ে তাঁকে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া অশোভন হবে। তাই তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের দেহের অলঙ্কার খুলে তাঁদের সঙ্গে যে পরিচারিকা ছিল তাকে সেইসব অলঙ্কার প্রাসাদে ফিবিয়ে নিয়ে যেতে বল্লেন। পরিচারিকা তাঁদের আদেশ অমান্য করতে পারেনি; সে অলঙ্কারের ভার নিয়ে প্রাসাদের দিকে চললো কিন্তু ক্রমেই এই অলঙ্কারের ভার তার কাছে দুর্ব্বিসহ বলে মনে হলো। তার নিজের দুরদৃষ্টের কথা ভেবে তার মনে দুঃখ হলো—সবাই সেই করুণাময় মহামানবকে দেখতে পাবে আর সে-ই শুধু দর্শনবঞ্চিত হয়ে থাকবে? সে অলঙ্কারের বোঝা নিয়ে দ্রুতপদে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেল। তারপর সেই অলঙ্কারপত্র সেইখানে রেখে সে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে

লাগলো ন্যগ্রোধ আরামের দিকে। তার কেবলি মনে হতে লাগলো তার দেরী হয়ে গেছে, সেই বহুবাঞ্ছিত পরম পুরুষের দর্শন সে আর পাবে না, দ্রুততর এগিয়ে চললো সে। পথ-প্রান্তর জনহীন। কপিলবাস্তুর জনতা তখন বুদ্ধের বাসভবনে সমবেত হয়েছে। রাজপ্রাসাদ থেকে ন্যগ্রোধ বনের দূরত্বও কম নয়। তার গতি যতই দ্রুত হোক না কেন, তার মনে হচ্ছিল সে দূরত্ব অতিক্রম করা যেন তার সাধ্যাতীত। তার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে আসছিল। ক্রমে তার গতি শ্লথতর হয়ে এলো, বক্ষস্পন্দন দ্রুততর হলো, তবু তার চলার বিরাম নেই—ঐ তো খানিকদূরে ন্যগ্রোধ বনের তটরেখা দেখা যাচ্ছে, আর একটু গেলেই সেই বহুজন বাঞ্ছিত পুরুষের দর্শন পাওয়া যাবে, কিন্তু ঐ কয়েক সামান্য পা'য়ের দূরত্ব অতিক্রম করা তার সাধ্যে হলো না। সে উপলব্ধি করলো তার অন্তিম মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। তার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে তার দেহমনের সমস্ত ইচ্ছা একটি অদৃশ্য প্রণাম হয়ে বুদ্ধের পায়ে লুটিয়ে পড়লো। বুদ্ধকে দিয়ে গেল সে শ্রেষ্ঠদান—জীবনদান।

কপিলবাস্তুতে অবস্থানকালে রাজপরিবারের আরো এক বিশিষ্ট যুবা বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিলেন—এঁর নাম 'আনন্দ'। ইনি বুদ্ধের পিতৃব্য-পুত্র। বুদ্ধ এঁকে খুব ভালবাসতেন। আনন্দ যথা-সাধ্য চেষ্টা করতেন বুদ্ধের ভালবাসার উপযুক্ত হতে। আনন্দ'র এ প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধ আনন্দকে ভিক্ষু-শ্রেষ্ঠ বলে অভিনন্দিত করেছিলেন।

কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধ ফিরে এলেন রাজগৃহে। রাজগৃহকে তিনি তাঁর কর্ম্মকেন্দ্ররূপে বেছে নিয়েছিলেন—এইখান থেকে তিনি পরিক্রমায় বার হতেন আর পরিক্রমা শেষ করে তিনি বর্ষা ঋতুতে রাজগৃহে ফিরে আসতেন। বুদ্ধ প্রতিদিন ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ করতেন, তারপর হাত মুখ ধুয়ে অন্তর্বাস পরে

নির্জ্জনে ধ্যান করতেন। ধ্যানান্তে বহির্বাস পরে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তিনি যখন যে নগরে থাকতেন সেই নগরের রাজপথে পরিভ্রমণ করতেন। গৃহীর দ্বারে উপস্থিত হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতেন। গৃহস্বামী যদি স্বেচ্ছায় তণ্ডুল দান করতেন—তাহলে তিনি সেই দান সানন্দে গ্রহণ করে গৃহান্তরে যেতেন। ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হওয়া মাত্র তিনি তার নির্দ্দিষ্ট আবাসে ফিরে আসতেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিয়ে যে আহার্য্য প্রস্তুত হতো শিষ্যদের সঙ্গে তা গ্রহণ করতেন—আহার শেষে তিনি কিছুক্ষণ তাঁদের সঙ্গে নানাবিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।



মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হলে তিনি তাঁর নির্দ্দিষ্ট কক্ষে অথবা গুহায় বিশ্রাম করতেন। অপরাহ্নে যাঁরা তাঁকে দর্শনের জন্য আসতেন তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি তাঁদের নানাবিষয় উপদেশ দিতেন। দর্শনার্থীরা ফিরে গেলে বুদ্ধ স্নান সমাপন করে বেশ

পরিবর্ত্তন করতেন। সন্ধ্যাকালে দর্শনার্থী এবং শিষ্যদের সঙ্গে তিনি আবার মিলিত হতেন। ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনার পর সকলেই যখন ফিরে যেতেন তখন বুদ্ধ তাঁর কক্ষে আবার ধ্যান-মগ্ন হতেন। ধ্যান শেষে তিনি শয্যা গ্রহণ করতেন। এইভাবে বুদ্ধের প্রতিদিন কাটতো।

ক্রমশঃ বুদ্ধের দর্শনার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো, আর তাঁর কাছে থেকে যাঁরা ভিক্ষাগ্রহণ করতেন তাঁদের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চললো। জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে বুদ্ধ সকলের কাছে তাঁর ধর্ম্মপ্রচার করতেন। সহজ সরল তাঁর ধর্ম্মমত। এতে দার্শনিক কোনো জটিলতা নেই। সাধারণ লোক সহজেই এই ধর্ম্মতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে এমনি ভাষায় বুদ্ধ তাঁর মতবাদ প্রচার করতেন। তাঁর প্রতিটি কথা শ্রোতার অন্তর স্পর্শ করতো—তারা উৎকর্ণ হয়ে শুনতো তাঁর বাণী। তারপর সর্ব্বপ্রকার বাসনা রহিত হয়ে তারা বুদ্ধকেই তাদের একমাত্র শরণ বলে গ্রহণ করতো। দূর-দূরান্তর থেকেও বহু দর্শনার্থী প্রতিদিন রাজগৃহে এসে সমবেত হতো। বুদ্ধের পাদস্পর্শে রাজধানী রাজগৃহ রূপান্তরিত হলো পূণ্য ভূমিতে।

রাজগৃহে যাঁরা বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সুদত্ত বা অনাথপিণ্ডদের নাম সুপরিচিত। সুদত্ত ছিলেন শ্রাবস্তীর এক পরম ধনবান শ্রেষ্ঠী। শ্রাবস্তী ছিল কোশল রাজ্যের রাজধানী। তখন কোশলে রাজত্ব করতেন প্রসেনজিৎ। শ্রাবস্তী তখন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী ব'লে কীর্ত্তিত ছিল। সুদত্ত শুধু ধনবান শ্রেষ্ঠীই ছিলেন না—তিনি কোশল-রাজের মন্ত্রীসভার সদস্যও ছিলেন। রাজকার্য্য এবং ব্যবসা উপলক্ষে সুদত্ত প্রায়ই রাজগৃহে আসতেন। কপিলবাস্তু থেকে বুদ্ধ রাজগৃহে ফিরে আসার কিছুদিন পরে সুদত্ত মগধ রাজধানীতে এসেছিলেন। তিনি যে গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সেই গৃহে সশিষ্য বুদ্ধ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

সুদত্ত বুদ্ধের নাম শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়নি। রাজগৃহে এই শ্রেষ্ঠীর গৃহে সুদত্ত বুদ্ধ-দর্শন করলেন। বুদ্ধের দিব্যকান্তি এবং উপদেশ সুদত্তের অন্তর সহজেই স্পর্শ করলো। ধনবান শ্রেষ্ঠী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। এর পর থেকে সুদত্ত প্রায়ই রাজগৃহে আসতেন। বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর থেকে সুদত্তের জীবনধারায় এলো বিরাট পরিবর্ত্তন। যে বিপুল ধনসম্পদ তিনি নিজের ও পরিবারের সুখ-সম্ভোগের জন্য দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত করে রেখেছিলেন সেই সম্পদ তিনি এখন অকাতরে উৎসর্গ করে দিলেন দীন-দুর্গতদের সেবায়। তিনি অনাথের অন্নদাতা ছিলেন তাই তিনি পরিচিত হলেন অনাথপিণ্ডদ নামে।

সুদত্তের একান্ত ইচ্ছা হলো বুদ্ধদেব কিছুদিন শ্রাবস্তীতে অতিবাহিত করেন। তিনি তাঁর এই অভিপ্রায়ের কথা তথাগতকে জানালেন। তার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ বল্লেন যে জনাকীর্ণ নগরের প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। কিন্তু যদি নির্জ্জন সাধনার উপযোগী কোনো স্থান সংগ্রহ করা যায় তাহলে সুদত্তের অভিলাষ তিনি পূর্ণ করবেন।

বুদ্ধের কাছে আশ্বাসবাণী পেয়ে সুদত্ত হৃষ্টমনে ফিরে গেলেন শ্রাবস্তীতে। জনাকীর্ণ নগরের এক প্রান্তে ছিল জেতবন নামে এক বিরাট উদ্যান। মনোরম পরিবেশের মধ্যে জনবহুল নগর থেকে দূরে অবস্থিত এই স্থানটি বুদ্ধের অমনোনীত হবে না ভেবে সুদত্ত এই স্থানটি সংগ্রহ করতে চাইলেন। এই উদ্যানটি ছিল প্রসেনজিতের পুত্র যুবরাজ জেত-এর। সুদত্ত জেত-এর কাছে এই উদ্যানটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সুদত্তের ধনের খ্যাতি জেত-এর নিকট অজ্ঞাত ছিল না। ঐ স্থানটি সংগ্রহের জন্য সুদত্তের আগ্রহাতিশয্য দেখে জেত তাঁকে জানালেন যে— যে স্থানটি জুড়ে ঐ উদ্যানটি বিস্তৃত আছে, সেই সমগ্র স্থানটি

যদি সুদত্ত স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ঢেকে দিতে পারেন তাহলে তিনি ঐ স্থানটি বিক্রয় করতে সম্মত হবেন। সুদত্ত এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। পরদিন নাগরিকরা সবিস্ময়ে দেখলো সুদত্তের প্রাসাদ থেকে স্বর্ণমুদ্রাবাহী শকট স্রোতের মত নগরের উপকণ্ঠে এসে জেতবন নামে পরিচিত স্থানটিকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে। প্রায় সমস্ত স্থানটি স্বর্ণমুদ্রায় আচ্ছাদিত হয়ে গেছে—মাত্র অল্প একটু স্থান বাকী আছে—এমন সময় যুবরাজ জেত সেখানে উপস্থিত হলেন। সুদত্ত ধনবান একথা তিনি জানতেন কিন্তু তিনি এত অপর্য্যাপ্ত ধনের অধিকারী—এ সংবাদ তাঁর অজানা ছিল। জেতের মনে আরো একটি প্রশ্ন জাগালো কোন অভিপ্রায়ে ধনবান শ্রেষ্ঠী তার সমস্ত ধনের বিনিময়ে এই স্থানটি সংগ্রহ করতে উদ্যত হয়েছেন? সুদত্তের মুখে যখন তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানতে পারলেন তখন যুবরাজের মনে হলো সুদত্ত একাই এই সৌভাগ্য অর্জ্জনের অধিকারী হবেন কেন? তিনিও কেন এই সৌভাগ্য অর্জ্জনের সুযোগ গ্রহণ করবেন না? তাই যুবরাজ ঘোষণা করলেন, উদ্যানের যে অংশটি তখনও অনাচ্ছাদিত ছিল সেই অংশে তিনি নিজ ব্যয়ে ভিক্ষুদের বাসোপযোগী বিহার নির্ম্মাণ করে দেবেন। তার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হলো। দেখতে দেখতে সেই প্রান্তরে রচিত হলো সুদৃশ্য এক বিরাট আয়তন বিহার। এরই একটি কক্ষ নির্দ্দিষ্ট হলো ভগবান বুদ্ধের বাসকক্ষরূপে। চন্দন কাষ্ঠে নির্ম্মিত এই কক্ষটি গন্ধকুটি নামে পরিচিত। জেত কর্তৃক নির্ম্মিত প্রাসাদ-সমেত সুদত্ত দত্ত এই স্থানটি পরবর্ত্তীকালে জেতবন বিহার নামে পরিচিত হয়েছিল। এই বিহারে বুদ্ধ দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন।

রাজগৃহে বুদ্ধ প্রতিদিন ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে বার হতেন। যখন এই দিব্যকান্তি পুরুষটি নগরের রাজপথ দিয়ে যেতেন তখন নগরের রুদ্ধদ্বার গৃহগুলি খুলে যেতো, অলিন্দে বাতায়ন পার্শ্বে

দাঁড়াতেন পুরনারীরা,—শ্রদ্ধায় বিস্ময়ে তাঁরা নির্ণিমেষ চোখে চেয়ে থাকতেন মহাভিক্ষুর গতিপথে। সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যেও এই উপলক্ষে দেখা যেত অপূর্ব্ব উন্মাদনা। একদিন ভিক্ষারত সন্ন্যাসীকে দূর থেকে আসতে দেখে রাজার মালী তার সংগৃহীত পুষ্পস্তবক ভিক্ষুর হাতে তুলে দিল। প্রতিদিন রাজ-সভায় ফুল যোগানো তার কাজ ছিল—সেদিনও রাজসভার জন্যই মালী ফুল নিয়ে যাচ্ছিল। পথে বুদ্ধদেবের দিব্যকান্তি দেখে তাঁর মনে হলো এঁকে পুষ্প নিবেদন করতে পারলে সে কৃতার্থ হবে, তাই মালী নিঃশেষে তাঁর পুষ্পার্ঘ্য বুদ্ধের হাতে তুলে দিয়ে গৃহে ফিরে গেল। এই রাজসভায় ফুল দিবার জন্য সে রাজকোষ থেকে অর্থ পেতো। সেদিন সে যখন শূন্য হাতে গৃহে ফিরে গেল—তখন শূন্য হাতে ফিরে যাওয়ার জন্য সে স্ত্রীর কাছ থেকে শুধু লাঞ্ছনাই পেয়েছিল তা নয়—সে রাজসভায় গিয়ে রাজার কাছে মালীর নামে অভিযোগ আনলে এবং মালীর শাস্তি বিধান করা হোক এ প্রার্থনাও জানালে। বিম্বিসার ধৈর্য্য ধরে তার অভিযোগ শুনলেন কিন্তু তিনি মালীকে ডেকে শাস্তি দেওয়া দূরের কথা—তাকে পুরস্কৃত করলেন। এমনি করে দিনের পর দিন জনচিত্তে বুদ্ধের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে লাগলো। রাজা থেকে সাধারণ স্তরের নরনারীর কাছে বুদ্ধ প্রিয় থেকে প্রিয়তর হতে লাগলেন।

রাজগৃহে যারা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জীবক-এর নাম উল্লেখযোগ্য। সেই যুগে জীবক ছিলেন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল এবং বিম্বিসার পুত্র অভয়ের গৃহে তিনি প্রতিপালিত হয়েছিলেন। তারপর কিশোর বয়সে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তিনি তক্ষশিলায় গিয়েছিলেন। সেকালে তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যাচর্চার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। এখানে বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্রে শিক্ষাদান করা হতো। ভারত-বর্ষের নানা জায়গা থেকে তরুণ শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হতো।

কৃতবিদ্য অধ্যাপকেরা এখানে শিক্ষাদান করতেন। জীবক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতবছর শিক্ষালাভ করেছিলেন। তার মনে হলো চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে যা জ্ঞাতব্য তা প্রায় সবই তিনি জেনেছেন; এবার তাঁর স্বদেশে ফেরার ইচ্ছা হলো। তিনি অধ্যাপককে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন। অধ্যাপক তখন তাঁকে বল্লেন তুমি তক্ষশিলার একযোজন পরিধির মধ্যে যেসব গাছ ওষধি হিসেবে মূল্যহীন সেগুলো সংগ্রহ করে এনে আমায় দেখাও। জীবক অধ্যাপকের নির্দ্দেশ মত তক্ষশিলার চারপাশের অঞ্চল খুঁজে দেখলেন—তাঁর চোখে এমন একটি গাছও পড়লো না, ভেষজ হিসাবে যার কোনো-না-কোন গুণ নেই। তিনি ফিরে এসে অধ্যাপককে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানালে অধ্যাপক সন্তুষ্ট হয়ে বল্লেন ঃ "জীবক, তোমার অধ্যয়ন সার্থক হয়েছে। তোমার শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। তুমি এবার স্বদেশে ফিরে গিয়ে রোগার্ত্তদের রোগ মুক্ত করো।"

গুরুর আদেশ পেয়ে জীবক রাজগৃহে ফিরে এলেন। কুমার অভয়ের নির্দ্দেশে তিনি গৃহে থেকে চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে চিকিৎসক হিসাবে জীবকের সুনাম ছড়িয়ে পড়লো। শুধু মগধ রাজ্যে নয়। কোশল, লিচ্ছবি এবং অবন্তী রাজ্যেও তাঁর খ্যাতি বিস্তৃত হয়েছিল। অবন্তীরাজ প্রদ্যোত তার চিকিৎসা গুণে নিরাময় হয়েছিলেন। জীবক শুধু চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন না, ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল এবং বুদ্ধের উপদেশে আকৃষ্ট হয়ে তিনি তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর জীবক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিরাময়ের জন্য তার শক্তি সামর্থ্য অকাতরে নিয়োজিত করে-ছিলেন। তার চিকিৎসার গুণে মুগ্ধ হয়ে অবন্তীরাজ তাঁকে একটি বহু মূল্যের রেশম বস্ত্র উপহার দিয়েছিলেন। বুদ্ধের অনুশাসন ছিল এই যে ভিক্ষুরা চীবর বস্ত্র ভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করতে পারবে

না। জীবক অবন্তীরাজের দেওয়া এই মহামূল্য বস্ত্রখানি নিয়ে বুদ্ধের কাছে গেলেন এবং এই উপহার বুদ্ধ স্বয়ং গ্রহণ করুন এই অনুরোধ জানলেন। বুদ্ধ জীবকের অনুরোধ রক্ষা করলেন। অতঃপর জীবক বুদ্ধের কাছে আরো একটি অনুরোধ জানালেন। এতকাল বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শ্মশানে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্ত্র থেকে চীবর সংগ্রহ করে তাই পরিধান করতেন। এবার জীবক অনুমতি চাইলেন যে ভিক্ষুরা অতঃপর স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বস্ত্র পরিধান করার অধিকারী হোক। বুদ্ধ জীবকের দ্বিতীয় অনুরোধও রক্ষা করলেন।

বুদ্ধ শুধু ধর্ম্মালোচনা নিয়েই নিবিষ্ট থাকতেন না। দুঃখ শোক তাপ পীড়িত মানুষ কি ভাবে বাসনার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্ব্বাণ লাভ করতে পারে—এটাই তার প্রধানতম চিন্তা ছিল; কিন্তু তিনি বাস্তব জীবনের সমস্ত সমস্যার প্রতিও উদাসীন ছিলেন না। ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যখন যেসব সমস্যা দেখা দিত, তিনি সাধ্যমত সেইসব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করতেন। রাষ্ট্রের বৃহত্তর ক্ষেত্রের সমস্যাও অনেক সময় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সাংসারিক জীবনের সমস্যার সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারেননি। তিনি যখন বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন তখন কপিলবাস্তুর শাক্যদের সঙ্গে তাদের প্রতিবেশী কোলিয়দের মনান্তর উপস্থিত হয়। এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত ছিল রোহিণী নদী। রোহিণীর জলসম্পদের অধিকার নিয়ে দু'টি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধের মধ্যস্থতার ফলে উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীরা সংঘর্ষের পথ ত্যাগ করে শান্তিপূর্ণ ভাবে তাদের বিবাদের অবসান করে। এমনি আরো দু'চারটি ক্ষেত্রে বুদ্ধের হস্তক্ষেপের ফলে অকারণ রক্তপাত ও লোকক্ষয় নিবারিত হয়েছিল।

রাজগৃহে বর্ষা উদ্‌যাপনের জন্য বুদ্ধ পার্শ্ববর্ত্তী লিচ্ছবি রাজ্যে

যেতেন। লিচ্ছবিরা তাঁকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁদের রাজধানী বৈশালী আর্য্যাবর্ত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগর ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে দেশ দেশান্তর থেকে বহু শিল্পী ও ব্যবসায়ী এখানে মিলিত হতো। এদের অনেকেই বুদ্ধের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এবং যখন স্বদেশে ফিরে যেতেন তখন সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন বুদ্ধের বাণী। এদের মাধ্যমে বুদ্ধের ধর্ম্মমত নানা দেশে এবং বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রভাব স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করার ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবেদন জনসাধারণের মধ্যে সহজে ব্যাপ্তিলাভ করেছিল। তাছাড়া তাঁর নিজের জীবন এবং ধর্ম্ম মতের সরলতা এই ধর্ম্মের প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করেছিল।

বুদ্ধ যখন বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি সংবাদ পেলেন যে পিতা শুদ্ধোদন গুরুতর পীড়ায় অসুস্থ। তিনি আরো জানতে পারলেন যে অন্তিম শয্যায় শায়ী পিতার শেষ ইচ্ছা, শেষবারের মত পুত্রমুখ দর্শন করবেন।

বুদ্ধ পিতার শেষ আদেশ পালন করতে কপিলবাস্তুতে চলে এলেন। শুদ্ধোদনের কাছে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম্মমতের ব্যাখা করলেন—তাই শুনে শুদ্ধোদন গভীর পরিতৃপ্তি লাভ করেছিলেন। শুদ্ধোদনের পরিবারের সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, এমন কি শুদ্ধোদন নিজেও বাদ যান নি। শাক্য-কুলে সকলেই যদি সঙ্ঘে যোগদান করে তবে রাষ্ট্রশাসনের দায়িত্ব কে পালন করবে? এই কথা ভেবে শেষ পর্য্যন্ত ভদ্রিক নামে একটি যুবককে সঙ্ঘে প্রবেশ করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। শুদ্ধোদন গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন—শরীর অনেক আগেই ভেঙ্গে পড়েছিল। শোকতাপও যথেষ্ট পেয়েছেন। তার দুর্ব্বল দেহ ব্যাধির আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না। পুত্রের কোলেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর বুদ্ধ বেশীদিন

কপিলবাস্তুতে থাকেন নি—তিনি রাজগৃহে ফিরে এলেন ; তারপর বৈশালীতে কিছুকাল অতিবাহিত করলেন।

বুদ্ধ যখন যেখানে থাকতেন তখন সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থীর ভীড় হতো! দূর দূরান্তর থেকেও বহু নরনারী তাঁর দর্শনার্থী হয়ে আসতো। বুদ্ধ তাদের যথাসাধ্য উপদেশ দিতেন। যখন তাঁর পক্ষে উপদেশ দান সম্ভব হতো না, তখন সারিপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন এবং আনন্দ এই কাজের ভার গ্রহণ করতেন।

বুদ্ধ যখন বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন তখন কপিলবাস্তু থেকে মহাপ্রজাবতী গৌতমীর নেতৃত্বে বহু শাক্য পুরনারী বুদ্ধের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সেখানে এসেছিলেন। বুদ্ধ যখন প্রথম কপিলবাস্তুতে গিয়েছিলেন তখনি মহাপ্রজাবতী এবং অন্যান্য শাক্য নারীরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণে অভিলাষী হয়ে শুদ্ধোদনের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তখন তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এখন শুদ্ধোদন পরলোক গমন করেছেন। মাতা প্রজাবতীর দুটি পুত্রই সন্ন্যাসের পথ বেছে নিয়েছেন—সুতরাং সংসারে তাঁর আর কোনো বন্ধন ছিল না। তাই তিনি এবং অন্যান্য পুরনারীরা সঙ্ঘে যোগদানের অভিপ্রায় নিয়ে বুদ্ধের সাক্ষাৎ প্রার্থিনী হলেন।

শাক্যনারীগণ তাঁর দর্শন প্রার্থিনী এবং তাঁরা সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমতি চাইছেন এই সংবাদ শুনে বুদ্ধ প্রথমে তাঁদের প্রার্থনা পূরণ করতে সম্মত হলেন না। বহু নারীকে তিনি উপদেশ দান করেছেন কিন্তু তাঁদের সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের কথা তিনি কখনই বলেননি। তাঁর মনে হতো গৃহই নারীর আদর্শ স্থান। কিন্তু আনন্দ এ বিষয় বুদ্ধের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি, দীর্ঘকাল ধরে আনন্দের সঙ্গে বুদ্ধের এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। আনন্দ তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "ভগবন! স্ত্রী জাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা সঙ্গত?" তার উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন: "অদর্শন—অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না।" আনন্দ তার

পরেও প্রশ্ন করলেন: "ভগবন! যদি সাক্ষাৎ হয় তখন কি করা কর্ত্তব্য?"

তার উত্তরে বুদ্ধ বল্লেন: "হে আনন্দ! অনালাপ—অর্থাৎ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করবে না।" তার পরেও আনন্দ প্রশ্ন করলেন: "ভগবন্! যদি তাঁরা আলাপ করেন তখন কি করা সঙ্গত?"

এই প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন, "হে আনন্দ! উপস্থাপন—অর্থাৎ তাঁদের দেবতার মত পূজা ও উপাসনা করবে।"

বুদ্ধের সঙ্গে আনন্দের যে আলাপ হয়েছিল তা থেকে মনে হয় নারী জাতির প্রতি বুদ্ধের অপরিসীম শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি নারীর সঙ্ঘে যোগদানের বিরোধী ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ তার মতে অবিচলিত থাকেন নি—যখন তিনি শুনলেন স্বয়ং মহাপ্রজাবতী সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমতি লাভের জন্য কপিলবাস্তু থেকে এই দূরের পথ অতিক্রম করে এসেছেন—তখন বুদ্ধ তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দান করেন।

বুদ্ধ যে সব নারীদের সঙ্ঘে যোগদান করার অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়—কিন্তু সংসার-ধর্ম্ম পালন করে যে সব নারী বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা অনেক। এই শ্রেণীর স্ত্রীভক্তদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন বিশাখা। ইনি সাকেত নগরবাসী এক ধনী শ্রেষ্ঠীর কন্যা। অল্প বয়সে শ্রাবস্তীর এক ধনী যুবকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। বুদ্ধের খ্যাতি শ্রাবস্তীতে বিস্তৃত হয়েছিল; এইস্থানের বহু অধিবাসী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিল। বুদ্ধ একবার শিষ্যদের অনুরোধে শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছেন—এই সংবাদ পেয়ে বিশাখার খুব ইচ্ছা হলো লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয় জয় করেছেন যে পরমপুরুষ তাঁকে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়ে তিনি তাঁর নারীজন্ম সার্থক করবেন। বিশাখার শ্বশুরকুল ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁরা প্রথমে তাঁর অনুরোধে কর্ণপাত

করলেন না, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিশাখারই জয় হলো—তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষার কাছে শ্বশুরকুলের আপত্তি পরাজয় মানলো।

বিশাখা প্রায়ই বুদ্ধের বিহারে যাতায়াত করতেন এবং বুদ্ধের অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করতেন। বিশাখার আমন্ত্রণ বুদ্ধ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বিশাখার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। বিশাখা শুধু আহার্য্য দান করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তিনি ভিক্ষুদের বর্ষাকালীন চীবর বিতরণ করবার অনুমতিও বুদ্ধের কাছে থেকে লাভ করেছিলেন। একবার বিশাখা বহুমূল্য অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে বুদ্ধের বাসস্থানে গিয়েছিলেন। তারপর বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি যখন নিজের গৃহে ফিরে আসছিলেন তখন ভুল করে একটি মহামূল্য অলঙ্কার ফেলে এসেছিলেন। বিশাখা চলে যাবার পর আনন্দ সে অলঙ্কার দেখতে পেয়ে সেটি একটি অনুচরের হাতে দিয়ে বিশাখার গৃহে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু বিশাখা সেটি আর গ্রহণ করতে চাইলেন না। তিনি বল্লেন: এ অলঙ্কার বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যাবে—সে অর্থ যেন ভিক্ষুদের সেবায় নিয়োজিত করা হয়। আনন্দ বিশাখার অভিপ্রায় জানতে পেরে সে অলঙ্কারটি বিক্রয় করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা সফল হলো না। অত মূল্যবান অলঙ্কার ক্রয় করার মত ধনী একজনকেও পাওয়া গেল না। এ খবর জানতে পেরে বিশাখা নিজেই অলঙ্কারটি ক্রয় করলেন বহু অর্থের বিনিময়ে। পরে এ অর্থ দিয়ে শ্রাবস্তীতে পূর্ব্বারাম নামে একটি বিরাট আয়তন বিহার নির্ম্মিত হয়েছিল।

বুদ্ধের শিষ্যাদের মধ্যে বৈশালীর আম্রপালী প্রধান। বুদ্ধ যখন বৈশালীতে অবস্থান করছিলেন তখন আম্রপালী তাঁকে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। যাঁরা খুব অভিজাত ও ধনী তাঁরাও বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাতেন—কিন্তু বুদ্ধ অনেকক্ষেত্রে

তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন না। আম্রপালীর আভিজাত্য অথবা কুলগৌরব কিছুই ছিল না, তবু বুদ্ধ তার আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আম্রপালী গভীর শ্রদ্ধাসহকারে বুদ্ধের সেবা করে বুদ্ধকে একটি আম্রবন দান করেছিলেন। বুদ্ধ এই দান খুব খুসী হয়ে গ্রহণ করেছিলেন। পরে আম্রপালী ভিক্ষুণী হয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন।

শ্রাবস্তী ছিল কোশল রাজ্যের রাজধানী। তখন কোশলে মহারাজ প্রসেনজিৎ রাজত্ব করতেন। সুশাসক, বীর, যোদ্ধা হিসেবে তাঁর খুব খ্যাতি ছিল। কিন্তু শুধু দেশ জয় আর রাজ্য-শাসন করে তিনি সুখী হতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হতো—সব থেকেও তাঁর যেন কিছু নেই। অনেক সাধু সন্ন্যাসীর কাছে তিনি উপদেশ নিয়েছেন—কিন্তু তিনি কারুর উপদেশেই তৃপ্ত হতে পারেন নি। বুদ্ধ যখন রাজগৃহে ছিলেন তখন প্রসেনজিৎ তাঁর কথা শুনে তাঁর সাক্ষাৎ প্রার্থী হয়ে রাজগৃহে গেলেন। বিম্বিসার বুদ্ধের অনুগত ছিলেন। প্রসেনজিৎ বিম্বিসারের প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। তারপর নগরীর উপকণ্ঠে যেখানে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে অবস্থান করছিলেন সেখানে গেলেন। অনেকক্ষণ ধরে বুদ্ধের সঙ্গে কোশলরাজের আলাপ আলোচনা হলো। প্রসেনজিতের সকল সন্দেহের অবসান, সকল প্রশ্নের সমাধান হলো। তিনি বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

কোশলরাজের সঙ্গে বুদ্ধের ঘনিষ্ঠতা হয়েছি [illegible] গ্রহণ করে বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে এসেছিলেন। যখন তাঁর পক্ষে আসা সম্ভব হতো না তখন প্রসেনজিত নিজে গিয়ে বুদ্ধকে দর্শন করে আসতেন। রাজকার্য্য সম্পর্কেও অনেক সময় প্রসেনজিৎ বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন। রাজার দৃষ্টান্ত দেখে তাঁর প্রজারা দলে দলে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ক্রমে রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী আর কপিলবাস্তু এই চারটি জায়গা বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

প্রসেনজিতের পুত্র জেত বুদ্ধের অনুরাগী ছিলেন; তার অর্থ সাহায্যে এবং সুদত্তের আগ্রহে শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসেনজিতের আরো একটি ছেলে ছিল, তাঁর নাম বিরূঢ়ক। যৌবনকাল থেকেই তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত হয়ে উঠেছিলেন। এর মা মল্লিকা ছিলেন শাক্যবংশীয়া মেয়ে। মল্লিকা এবং প্রসেনজিৎ দু'জনেই ছেলেকে কুসঙ্গীদের প্রভাব থেকে দূরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চেষ্টা সফল হলো না। বয়স যত বাড়তে লাগলো বিরূঢ়ক তত অবাধ্য হয়ে উঠলেন। কতকগুলি কুচক্রী লোকও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল। এদের সাহায্যে তিনি প্রসেনজিৎকে সরিয়ে কোশলের রাজা হতে চাইলেন। প্রসেনজিৎ বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন—আর বেশীদিন বাঁচবেন না, তা সত্ত্বেও বিরূঢ়ক অপেক্ষা করতে রাজী নয়।

প্রসেনজিতের মনে শান্তি নেই; দেহের শক্তিও কমে আসছে। একবার শেষবারের মত বুদ্ধের চরণ দর্শন করবেন এই তাঁর অন্তরের কামনা। বুদ্ধ সেই সময় কপিলবাস্তুতে ছিলেন। তখন শ্রাবস্তীতে তিনি আসবেন এ আশা কারুর ছিল না। তাই প্রসেনজিৎ নিজে দু'একজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে করে কপিলবাস্তু যাত্রা করলেন। বিরূঢ়ক আর তার সঙ্গীরা এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল। রাজার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিরূঢ়ক নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা করলেন। যারা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন তাদের কারাদণ্ডে অথবা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো। নতুন রাজা নিষ্কণ্টক হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেন।

বিরূঢ়ক যেদিন রাজা হলেন সেদিনই তাঁর মা মল্লিকা কোশল রাজ্যে আর থাকবেন না এই সঙ্কল্প করে নগর ত্যাগ করলেন। প্রসেনজিতের প্রধানা মহিষী বর্ষিকাও তাঁর সঙ্গিনী হলেন। কোশল রাজ্যের সীমানা ছেড়ে তাঁরা যাত্রা করলেন কপিলবাস্তুর

দিকে। প্রসেনজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই তাঁদের উদ্দেশ্য। প্রসেনজিত বুদ্ধের দর্শন লাভ করে নিজের রাজ্যে ফিরে আসছিলেন, এমনি সময় পথে মহিষীদের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁদের কাছেই বিরুঢ়কের কীর্ত্তির কথা জানতে পারলেন। নিজের রাজ্যে ফিরে যাবার তাঁর আর ইচ্ছা হলো না। জীবনের অবশিষ্ট দিন রাজগৃহেই অবস্থান করবেন মনে করে তিনি মগধ রাজ্যের দিকে অগ্রসর হলেন। বর্ষিকা ও মল্লিকা দু'জনেই তাঁর সঙ্গিনী হতে চেয়েছিলেন। বর্ষিকা অনুমতি পেলেন, কিন্তু বহু অনুনয় সত্ত্বেও মল্লিকাকে অনুমতি দেওয়া হলো না। রাজমাতা হবার চরম মূল্য দিতে তিনি ফিরে এলেন কোশল রাজধানীতে। এরপর প্রসেনজিৎ আর বেশীদিন বেঁচে থাকেননি। তাঁর মৃত্যুতে বুদ্ধ একজন পরম অনুগত ও হিতৈষী অনুচর হারালেন।

প্রসেনজিতের সঙ্গে বুদ্ধের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়ে অনেকবেশী অন্তরঙ্গতা ছিল মগধরাজ বিম্বিসারের সঙ্গে। সিদ্ধার্থ যখন কপিলবাস্তু থেকে বেরিয়ে পরিব্রাজক জীবন যাপন করছিলেন তখন কিছুদিনের জন্য রাজগৃহে অবস্থান করেন। এই তরুণ পরিব্রাজক যখন ভিক্ষাপাত্র হাতে রাজপথ পরিক্রমা করতেন তখন সহজেই সকলের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতো। বিম্বিসারও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে পরিব্রাজক এই মর্ম্মে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলেন যে তিনি যদি কোনো দিন বুদ্ধত্ব লাভ করতে পারেন তাহলে কিছুদিনের জন্য হলেও তিনি রাজগৃহে অবস্থান করবেন। বুদ্ধ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। বিম্বিসারের অনুরোধে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের পর প্রথম তিনটি বর্ষা বুদ্ধ রাজগৃহেই অতিবাহিত করেছিলেন। বিম্বিসার বুদ্ধের প্রতি আনুগত্যের চিহ্ন-স্বরূপ রাজগৃহের উপকণ্ঠে অবস্থিত বেণুবন দান করেছিলেন। তাছাড়া গৃধ্রকূটে যেখানে বুদ্ধ একভাবে অনেকদিন বাস করেছিলেন সেই পাহাড়ের গায়ে

পাথর কেটে বিম্বিসার দীর্ঘপথ জুড়ে সিঁড়ি করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ যতদিন গৃধ্রকূটে ছিলেন ততদিন প্রত্যহ বিম্বিসার তাঁকে দর্শন করতে আসতেন এবং বুদ্ধের অগণিত ভিক্ষু এবং গৃহী সন্ন্যাসীদের সঙ্গে একজায়গায় বসে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। কিন্তু প্রসেনজিতের মত বিম্বিসারের শেষ জীবনও দুঃখে অশান্তিতে কেটেছিল। বিম্বিসারের বয়স হয়েছে, তাঁর শরীরও ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। রাজকার্য্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারলে তিনি খুসী হন। কিন্তু কার হাতে তিনি রাজ্যভার দিয়ে যাবেন? তাঁর বড় ছেলে অজাতশত্রু—তাঁকে তিনি শাসনকার্য্যের অনুপযুক্ত মনে করতেন। কারণ তিমি প্রজার সুখ-সুবিধার চেয়ে নিজের ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতি নজর দেবেন—বিম্বিসার মনে মনে এই আশঙ্কাই পোষণ করতেন। কে তাঁর উত্তরাধিকারী হবে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে অজাতশত্রু বিম্বিসারকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন। ব্যাপারটা এমনি অতর্কিতে ঘটে গেল যে প্রজাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিবাদ হলো না। নির্ব্বিবাদে অজাতশত্রু রাজা হলেন।

যখন এরকম একটা বিপ্লব হয়ে গেল তখন বুদ্ধ গৃধ্রকূটে অবস্থান করছিলেন। বিম্বিসারকে যে কক্ষে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল তার গবাক্ষ থেকে গৃধ্রকূটের চূড়া দেখা যেতো। বৃদ্ধ সিংহাসনচ্যুত রাজা সেই চূড়ার দিকে চেয়ে দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু এটুকু সান্ত্বনাও তিনি বেশী-দিন পেলেন না। প্রতিহারীর কাছে সংবাদ পেয়ে অজাতশত্রু সেই জানলাটি একেবারে বন্ধ করে দিলেন। সেই অন্ধকার কারাগৃহে অর্দ্ধাহারে, অনাহারে বৃদ্ধ রাজার জীবনান্ত হলো। বিম্বিসারের মৃত্যুতে বুদ্ধ একজন পরম সুহৃদ হারালেন।

বুদ্ধ কপিলবাস্তু থেকে রাজগৃহে ফিরে এলেন; তার কিছুদিন পরে তিনি কৌশাম্বীতে তাঁর ধর্ম্মপ্রচার করার সঙ্কল্প

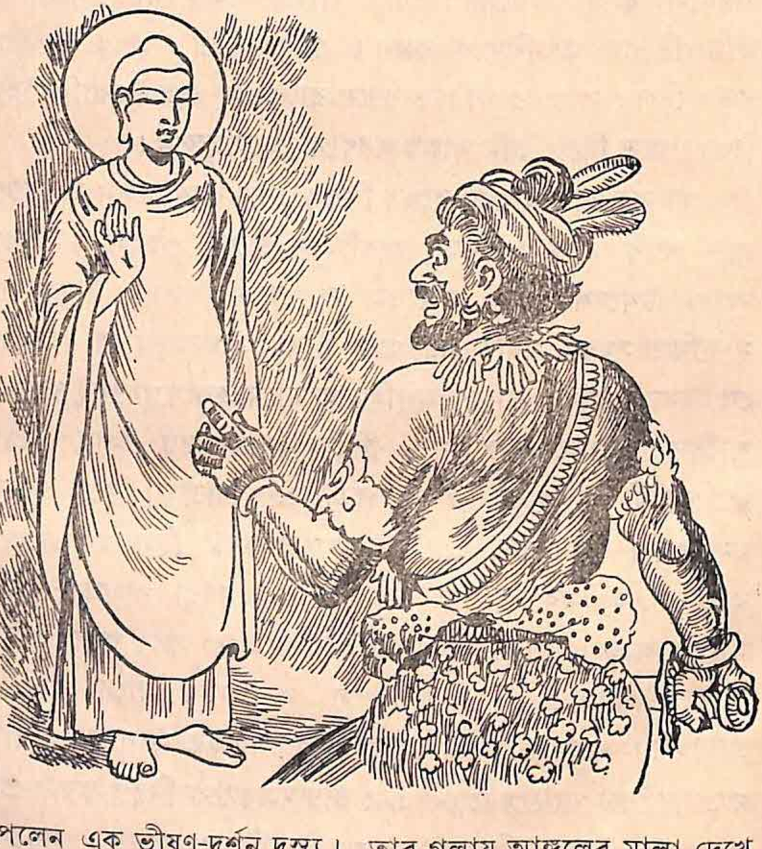
গ্রহণ করলেন। প্রথমে বুদ্ধ তাঁর দু'চারজন বিশ্বস্ত অনুচর পাঠালেন কিন্তু তার ফল যখন আশানুরূপ হলো না তখন নিজেই কৌশাম্বীতে গেলেন। কৌশাম্বীতে তখন উদয়ন রাজত্ব করতেন। তিনি আগে থেকেই বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির কাহিনী শুনেছিলেন—হয়তো এসব কাহিনী অতিরঞ্জিত হয়ে তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তাই প্রথমটা তিনি বুদ্ধদেব এবং তাঁর শিষ্যদের বেশী আমল দিতে চাননি, কিন্তু পরে যখন বুদ্ধদেবের সঙ্গে তাঁর দর্শন হলো তখন তাঁর কথাবার্ত্তা এবং উপদেশ শুনে উদয়ন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। রাজার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে তাঁর প্রজারাও অনেকে তাঁর শরণাগত হলো।

কপিলবাস্তু থেকে শ্রাবস্তী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছিল। আর্য্যাবর্ত্তের প্রায় সব ক'টি প্রধান রাজ্যের অধিপতিরা বুদ্ধদেবের পরম অনুগত হয়ে উঠেছিলেন। একবার রাজগৃহের কাছাকাছি এক গ্রামে বুদ্ধ বেড়াতে গিয়েছিলেন ; সঙ্গে আর কেউ ছিল না। কথা ছিল সেদিনই বেণু বনে ফিরে আসবেন। কিন্তু কোনো কারণে শেষ পর্য্যন্ত তা সম্ভব হলো না। সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখে বুদ্ধ এক গৃহস্থের বাড়ীতে রাত্রির মত আশ্রয় চাইলেন। গৃহস্বামী আশ্রয় দিতে আপত্তি করলেন না। তবে একথাও জানালেন যে অতিথিকে আশ্রয় দেবার মত একটির অতিরিক্ত কক্ষ তাঁর গৃহে নেই এবং কিছুক্ষণ আগেই তিনি ভিন্ন দেশবাসী এক পরিব্রাজককে সেই কক্ষে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন। যদি আগন্তুক এবং পরিব্রাজক একই কক্ষে রাত্রি যাপন করেন তাহলে গৃহস্বামীর কোনো আপত্তির কারণ নেই। পরিব্রাজকেরও কোনো আপত্তি ছিল না। তাই বুদ্ধ সেই কক্ষেই আশ্রয় নিলেন। সন্ধ্যার একটু পরেই পরিব্রাজক ধ্যান নিবিষ্ট হলেন। অনেক পরে যখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলো—তখন নবাগত আগন্তুক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন

তিনি কোন ধর্ম্মাবলম্বী এবং কোন গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন? পরিব্রাজক বল্লেন যে, তিনি ভগবান বুদ্ধ ছাড়া দ্বিতীয় গুরু স্বীকার করেন না, এবং বৌদ্ধধর্ম্মই তাঁর একমাত্র গতি। কিন্তু পরিব্রাজক বুদ্ধের অনুগত হলেও সাক্ষাৎভাবে বুদ্ধের দর্শনলাভ করেননি, সুতরাং যাঁর সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন তিনিই যে স্বয়ং বুদ্ধ একথা তিনি ধারণা করতে পারেননি। শেষে বুদ্ধ যখন আত্মপরিচয় দিলেন তখন পরিব্রাজক নত হয়ে পদধূলি ধারণ করলেন। এই পরিব্রাজকের নাম পুক্কসতি। ইনি ছিলেন তক্ষশিলার রাজা। বিম্বিসারের সঙ্গে এঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তারপর পরিণত বয়সে রাজ্যভার তাঁর উত্তরাধিকারীর উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিলেন।

যে সব রাজারাজড়া বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন বা যাঁদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল—তাঁরা কেবল ধর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন না, অনেক সময় রাজ্যশাসন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁরা বুদ্ধের দ্বারস্থ হতেন। সে সময় কোশল রাজ্যে অঙ্গুলিমাল নামে এক দস্যু সেই রাজ্যের শান্তির ব্যাঘাত করছিল। নিরীহ পথিকদের উপর অথবা শান্তিকামী গৃহস্থদের উপর অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের ধনসম্পত্তি এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত হরণ করাই ছিল তার একমাত্র কাজ। যে সব লোক তার হাতে মারা পড়তো তাদের হাতের আঙ্গুলগুলি কেটে নিয়ে সে মালার মত করে গলায় ঝুলিয়ে রাখতো। এইজন্য সে অঙ্গুলিমাল নামে পরিচিত হয়েছিল। তার ভয়ে কোশল রাজ্যের লোকেরা কাঁপতো। রাজা কতবার সৈন্য পাঠিয়ে তাকে এবং তার দলবলকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই তাঁর চেষ্টা বিফল হয়েছে। সকলেই যখন অঙ্গুলিমালের ভয়ে তটস্থ এমনি সময় বুদ্ধ একবার বল্লেন: অঙ্গুলিমাল যে বনে থাকে তিনি সেই বনে যাবেন। শিষ্যরা তাঁকে

নিবৃত্ত করতে চাইলেন; তাঁর হিতৈষীরা তাঁর নিরাপত্তা সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ কারুর নিষেধই মানলেন না। সঙ্গে কোনো অনুচর না নিয়ে তিনি একা সেই গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। নির্জ্জন বন—শুধু তাই নয়, তার আশে-পাশে এককালে যে সব সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল দস্যুর অত্যাচারে আজ সেগুলি জনশূন্য। যাই হোক, বনের ভিতর ঢুকে বুদ্ধ এগিয়ে চল্লেন। অনেকদূর এভাবে এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ তিনি দেখতে



পেলেন এক ভীষণ-দর্শন দস্যু। তার গলায় আঙ্গুলের মালা দেখে জানলেন, এই সেই অঙ্গুলিমাল। দস্যু তাকে দেখতে পেয়ে গর্জ্জন করে বল্লেঃ থামো! আর একপা এগোবে না।

বুদ্ধ যেমন চলছিলেন তেমনি এগিয়ে চল্লেন—থামবার কোনো লক্ষণ নেই। এতে দস্যু ভয়ানক ক্রুদ্ধ হয়ে আবার চীৎকার করে বলে উঠলো ঃ এইও! থামো বলছি!

উত্তরে বুদ্ধ সংযত কণ্ঠে বল্লেন ঃ আমি তো থেমেই আছি, তুমি থামো। দস্যু তার উত্তর শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার আদেশ অমান্য করার সাহস থাকতে পারে একথা সে ভাবতে পারেনি। 'আমি থেমেই আছি' এ-কথার অর্থ জানতে চাইলে বুদ্ধ তাঁকে বল্লেন যে তিনি অহিংসা ধর্ম্মে স্থির আছেন। তারপর তিনি দস্যুর অনুরোধ মত তাঁকে অহিংসা-ধর্ম্ম সম্পর্কে আরো উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশ দস্যুর হৃদয় স্পর্শ করলো। সে হিংসাবৃত্তি ভুলে গিয়ে বুদ্ধের চরণে আত্মসমর্পণ করলো। অঙ্গুলি-মালের মতন দুর্দ্ধর্ষ নরহন্তা দস্যু তাঁর অমৃতস্পর্শে নতুন জীবন লাভ করেছে—এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের মনে বুদ্ধের প্রভাব অনেকখানি বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বুদ্ধদেবের অগণ্য শিষ্যদের মধ্যে যাঁদের সঙ্গে তাঁর সবচেয়ে বেশী অন্তরঙ্গতা হয়েছিল, তাঁরা হলেন—আনন্দ, সারিপুত্র আর মৌদ্‌গল্যায়ন। আনন্দ ছিলেন শাক্যবংশীয় কুমার—বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র। তাঁর পিতা অমৃতোদন যখন দেখলেন যে, শাক্যবংশীয় বহু কুমার একের পর এক বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে তখন তাঁর পুত্র যাতে সেই পথের পথিক না হতে পারে সেই জন্য বুদ্ধ যখন কপিলবাস্তুতে ছিলেন তখন অমৃতোদন তাঁর পুত্রকে শ্রাবস্তীতে নিয়ে এসেছিলেন। বুদ্ধ যখন কপিলবাস্তু থেকে শ্রাবস্তী এলেন তখন অমৃতোদন পুত্রকে নিয়ে কপিলবাস্তুতে ফিরে গেলেন। তাঁর সঙ্গে যাতে আনন্দের সাক্ষাৎ না হয় তারজন্য তিনি সতর্কতামূলক সব রকম ব্যবস্থাই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সব ব্যবস্থাই ব্যর্থ হলো। একদিন অমৃতোদন বাড়ী ফিরে দেখলেন যে ছোট ছেলে আনন্দ বুদ্ধের কাছে গভীর

মনোযোগ দিয়ে তাঁর উপদেশ শুনছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। বুদ্ধ কবে কপিলবাস্তুতে এলেন, আর কি করেই বা আনন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো তা ভেবে পেলেন না! যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ যখন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন বলে তাঁর অনুমতি চাইলেন তখন পুত্রের আগ্রহ দেখে অমৃতোদন অনুমতি না দিয়ে পারলেন না। তারপর ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে চীবর পরিধান করে আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন—আর গৃহে ফিরলেন না। সমস্ত অন্তর দিয়ে আনন্দ তথাগতের সেবাকে জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করলেন। বুদ্ধও তাকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন। উভয়ের মধ্যে খুব অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো। ক্রমে বুদ্ধের বয়স যখন পঞ্চাশোর্দ্ধে হলো তখন তাঁর অনুচরদের কথামত তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে সব সময়ের জন্য তাঁর সহচর করে নিতে তিনি সম্মত হলেন। এ বিষয় যখন অনুচরদের মত জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তাঁরা প্রায় সকলেই একবাক্যে আনন্দের কথা বল্লেন। আনন্দ বুদ্ধের সেবা করতে পারলে আর কিছু চাইতেন না; কিন্তু এই দুরূহ দায়িত্ব তিনি একলা বহন করতে সাহসী হলেন না। যাঁর জীবনের মূল্য পরিমাণ করে শেষ করা যায় না—সেই লোকটিকে দেখাশোনা করার, সেবা করার, সমস্ত দায়িত্ব বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কি? কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আনন্দ রাজী হলেন। তখন থেকে পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি বুদ্ধের ছায়ার মত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরতেন; একাধারে সচিব, সখা, মিত্র হয়েছিলেন। পরে তাঁর অবর্ত্তমানে বুদ্ধ আনন্দের উপরই সঙ্ঘ এবং ভিক্ষুদের তত্ত্বাবধান করার ভার অর্পণ করেছিলেন।

মৌদ্‌গল্যায়ন আর সারিপুত্র দু'জনেই বুদ্ধভক্ত হিসাবে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এঁরা দু'জনেই ছিলেন নালন্দার অধিবাসী। অল্প বয়সেই এঁরা বিভিন্ন শাস্ত্রে প্রভূত

পাণ্ডিত্য লাভ করেছিলেন। এঁদের গুরু ছিলেন সঞ্জয় নামে এক পরম শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কিন্তু শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেও এঁদের মনের সব জিজ্ঞাসার সমাধান হয়নি। পরে বুদ্ধ যখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন তখন বুদ্ধের দর্শন পেয়ে এবং তাঁর উপদেশ শুনে এঁরা দু'জনেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এঁরা দু'জনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু কষ্ট স্বীকার করেছিলেন এবং বুদ্ধ ছাড়া তাঁর জীবিতকালে এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এঁদের মত এত ত্যাগ স্বীকার কেউ করেননি। ধর্ম্মপ্রাণতা এবং বিদ্যাবত্তার জন্য সকলেই এঁদের শ্রদ্ধা করতেন এবং বুদ্ধ নিজেও অনেক বিষয় এঁদের মতামত এবং উপদেশ মেনে চলতেন।

সারিপুত্র ছিলেন অত্যন্ত বিদ্বান ও বিনয়ী আর মৌদ্গল্যায়ন বিদ্বান হয়েও এতটা বিনয়ী ছিলেন না। নানা ধরনের অলৌকিক বিদ্যার অধিকারী ছিলেন তিনি। অনেক সময় তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখিয়ে লোকের বিস্ময় উদ্রেক করতেন। সারিপুত্র মৌদ্গল্যায়ন এঁরা দু'জনেই বুদ্ধের জীবদ্দশায় লোকান্তরিত হয়েছিলেন। অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৌদ্গল্যায়নের মৃত্যু হয়েছিল। তিনি রাজগৃহে ঋষিগিরির গুহায় থেকে নির্জ্জন বাস করছিলেন, সেইখানে একদিন একদল দস্যু আক্রমণ করে তাঁকে অমানুষিকভাবে প্রহার করলো ও পরে দেহ অস্থি সব টুকরো করে ঝোপের ভিতর ফেলে দিল। পরে তাঁর হত্যাকারীরা যখন রাজদ্বারে আনীত হলো, তখন তারা স্বীকার করলো যে রাজগৃহবাসী জৈনদের প্ররোচনায় তারা মৌদ্গল্যায়নকে হত্যা করেছে।

মৌদ্গল্যায়নের শোচনীয় মৃত্যুর কথা জেনে সবাই দুঃখিত হলেও বুদ্ধ সুখ-দুঃখের অতীত ছিলেন। এ সংবাদ শুনে বুদ্ধের বাইরে কোনো পরিবর্ত্তন দেখা গেল না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে তিনি অনুভব করলেন মৌদ্গল্যায়নের অনুপস্থিতিতে ধর্ম্ম-

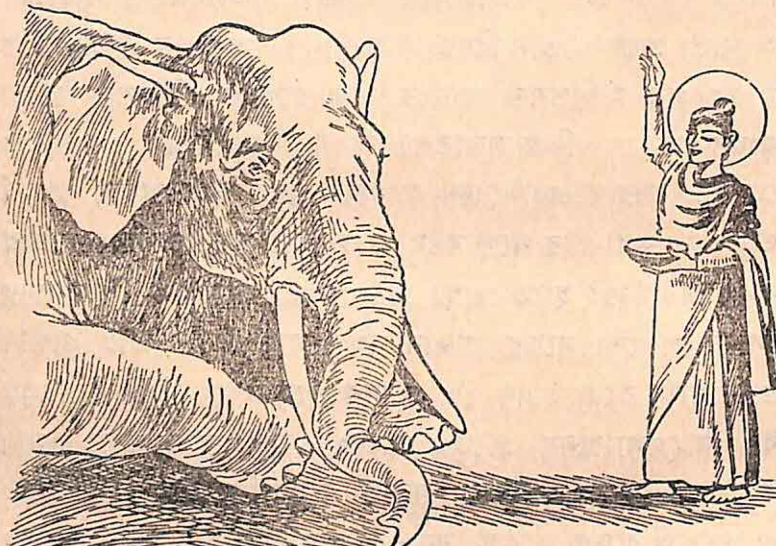
প্রচারের কাজ ব্যাহত হবে। তারপর শিষ্যরা যখন মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন তখন বুদ্ধ তাঁদের ডেকে মৌদ্‌গল্যায়নের পূর্ব্বজন্মের কাহিনী শোনালেন। বুদ্ধ সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন, তাই সকলের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত তিনি জানতেন। এর আগের জন্মে মৌদ্‌গল্যায়ন এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতামাতার তিনি একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতামাতা বৃদ্ধ হয়ে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, আর সে সময় তিনি তাঁদের অক্লান্তভাবে যত্ন করতেন। কিন্তু যখন তাঁর বিবাহ হলো, তারপর থেকে স্ত্রীর প্রভাবে তাঁর একটা খুব পরিবর্ত্তন হলো। আর তাঁর বাবা-মার যত্ন করা দূরের কথা, কোনো খোঁজখবরই রাখতেন না। শুধু তাই নয়—একদিন তিনি স্ত্রীর কথায় পিতামাতাকে গ্রামান্তরে নিয়ে যাবার ছল করে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে তিনি যেন ডাকাত এইভাবে চীৎকার করতে করতে তাঁদের হত্যা করলেন। অন্ধ পিতামাতা ভাবলেন—তাঁরা ডাকাতের হাতে পড়েছেন। মৌদ্‌গল্যায়নের পূর্ব্বজন্মের পাপের ফলে এ জন্মে এমনি শোচনীয় ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর পর সারিপুত্র ও আনন্দ দু'জন বুদ্ধের প্রধান সহায় হয়ে রইলেন। সারিপুত্র নানাস্থান ভ্রমণ করে বুদ্ধের বাণী জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে বেড়াতেন, আর বর্ষাকালে বুদ্ধ যেখানে অবস্থান করতেন তিনিও এসে সেখানে থাকতেন। আনন্দ সব সময়ই বুদ্ধের কাছে কাছে থাকতেন। প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাট কাজ থেকে বড় কাজ পর্য্যন্ত আনন্দ ছাড়া বুদ্ধের চলতো না। কেউ বুদ্ধের দর্শনপ্রার্থী হয়ে এলে প্রথমে আনন্দের সঙ্গে তার দেখা করতে হতো। এমনি প্রতিদিন কত শত দর্শনার্থী আসতেন তার ইয়ত্তা নেই। অসম্ভব কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে তাঁর দিন কেটে যেতো। তিনি ছিলেন সকলের প্রিয়। মুখে সর্বদাই হাসি লেগেই থাকতো।

বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে দেবদত্ত ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। ইনিও শাক্যবংশের ছেলে। শাক্যবংশের অন্যান্য কুমারদের মতন ইনিও বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ছোটবেলায় সিদ্ধার্থের সঙ্গে এঁর খুব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। অন্যান্য সকলের সঙ্গে দেবদত্ত যখন বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন তখনও মনের দিক থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান হয়নি। নানাভাবে গোপনে তিনি বহুবার বুদ্ধকে বিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি তাঁর প্রাণ সংহারের অপচেষ্টা থেকেও তিনি বিরত থাকেননি। মগধরাজ বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু মগধের রাজা হলেন। বিম্বিসার ছিলেন বুদ্ধের পরমভক্ত, কিন্তু অজাতশত্রু ছিলেন বুদ্ধ বিদ্বেষী। একবার দেবদত্ত বুদ্ধের কাছে নিবেদন করলেন—বুদ্ধ বৃদ্ধ হয়েছেন, সঙ্ঘের তত্ত্বাবধান করা তাঁর পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে, সুতরাং সঙ্ঘের কর্তৃত্ব যেন তাঁরই হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। দেবদত্ত কি ধরনের লোক তা তো বুদ্ধের অজানা ছিল না; তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বল্লেন যে দেবদত্ত দূরে থাক তিনি সারিপুত্র বা মৌদ্গল্যায়নের হাতেও সঙ্ঘের নেতৃত্ব ছেড়ে দেবেন না। এই প্রত্যাখ্যানে দেবদত্ত অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলেন। অজাতশত্রু বুদ্ধের অনুগত নন—দেবদত্ত এই সংবাদ জেনে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং তাঁর সাহায্যে বুদ্ধকে হত্যা করার সঙ্কল্প করলেন। অজাতশত্রুর অনেকগুলি হাতীর মধ্যে রত্নপাল নামে একটি পাগলা হাতী ছিল—সে যে কত লোকের প্রাণনাশ করেছে তার হিসাব নেই। শেষ পর্যন্ত এ হাতীটাকে হাতীশালে আটক করে রাখা হলো আর তার গলায় ঘণ্টার মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। যদি কোনও দিন কোনরকমে হাতীশালা থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে তাহলে ঘণ্টার আওয়াজ শুনে লোক সাবধান হবে।

রাজগৃহের এক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে একদিন তাঁর গৃহে আতিথ্য

গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আর বুদ্ধও এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন। অজাতশত্রু এ সংবাদ জানতে পেরে যেদিন বুদ্ধ শ্রেষ্ঠীর গৃহে আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে যাবেন সেইদিন সেই পথে সেই পাগলা হাতীকে ছেড়ে দেওয়া হবে—মাহুতের সঙ্গে এই রকম ব্যবস্থা করলেন। নিমন্ত্রণকারী শ্রেষ্ঠী কোনরকমে এই গোপন ষড়্যন্ত্রের কথা জানতে পেরে বুদ্ধকে সেদিনের পরিবর্ত্তে অন্য



দিন আমন্ত্রণ গ্রহণ করার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হলেন না। নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি নির্দ্দিষ্ট পথে শ্রেষ্ঠীর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন; তাঁর সঙ্গে পাঁচ শত ভিক্ষু; তাঁরা খানিকদূর অগ্রসর হতে দূর থেকে শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনি। একটু পরেই সেই ভীষণদর্শন হাতীটিকে শুঁড় তুলে সবেগে আসতে দেখা গেল। তার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখে ভিক্ষুরা সকলে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেল। শুধু থাকলেন আনন্দ। কিন্তু বুদ্ধকে একটুও বিচলিত

হতে দেখা গেল না। তিনি রাজপথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন। হাতীটি এতক্ষণ ত্বরিৎ বেগে আসছিল। কিন্তু বুদ্ধের কাছাকাছি আসামাত্র যেন মায়াবলে হাতীর হিংস্র ভাব অন্তর্হিত হয়ে গেল। সে শুঁড় নীচু করে বুদ্ধের সামনে দাঁড়ালো তারপর আস্তে আস্তে পিছন ফিরে হাতীশালার দিকে ফিরে গেল। দেবদত্ত রাজপথের এক গৃহের বাতায়ন থেকে এই দৃশ্য দেখছিলেন। বুদ্ধের কাছে পশুর হিংস্রতাও অন্তর্হিত হয়ে যায় দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, কিন্তু তবু বুদ্ধের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ কাটেনি। কিছুদিন পর বুদ্ধ যখন গৃধ্রকূটে অবস্থান করছিলেন তখন দেবদত্ত আর একবার তাঁর শত্রুতাসাধনের চেষ্টা করেছিলেন। বুদ্ধ একদিন অপরাহ্ণে গৃধ্রকূটের ছায়ায় পাদচারণা করছিলেন এমন সময় দেবদত্ত পাহাড়ের উপর থেকে একখানা মস্ত পাথর বুদ্ধকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। সৌভাগ্যক্রমে সে পাথরখানা আর একটি পাথরের গায়ে আটকে ভেঙ্গে গেল। তার দু' একটি বিক্ষিপ্ত টুকরো বুদ্ধের পায়ের কাছে এসে পড়লো। তাতে যে ক্ষত হয়েছিল তার জন্য কিছুদিন তাঁকে জীবকের চিকিৎসাধীনে থাকতে হয়েছিল। পাথরখানা যখন গড়িয়ে আসছিল তখন উপরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেবদত্তকে দেখতে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে একটি কথাও বলেননি। সেই সময় তাঁর শিষ্যরা তাঁর সঙ্গে সব সময় দু'চারজন দেহরক্ষী অনুচর থাকবে এই প্রস্তাব করাতে তিনি তাতে সম্মত হননি। তিনি বলেছিলেন যে, সময় না হলে কেউই তথাগতের প্রাণহানি করতে পারবে না। এইভাবে যখন বুদ্ধের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল তখন দেবদত্ত অন্য উপায়ে বুদ্ধের প্রতি তাঁর শত্রুতাসাধনে উদ্যত হলেন। তিনি তখন সঙ্ঘে কতকগুলি নতুন নিয়ম প্রবর্ত্তন করতে চাইলেন, আর এই উপলক্ষে যাতে ভিক্ষুদের মধ্যে দলাদলি দেখা দেয় সেই দিকে চেষ্টা করতে লাগলেন। দেবদত্তর চেষ্টা

খানিকটা সফল হয়েছিল কিন্তু যে সব ভিক্ষু তাঁর মতানুবর্ত্তী হয়েছিল তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয় এবং কিছুদিন পরে সারিপুত্রের চেষ্টায় দেবদত্তের অনুচরদের মধ্যে অনেকেই আবার বুদ্ধের শরণাগত হয়েছিলেন। যাই হোক, দেবদত্ত বৌদ্ধদের মধ্যে কিছুটা পরিমাণে হলেও ভেদ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদের সংখ্যাও ক্রমশঃও বেড়ে গিয়েছিল, তাই বুদ্ধের দৃষ্টি ক্রমশঃ বৃহত্তর ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হতে লাগলো। তখন ভারতে অন্যান্য যে সব ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাঁদের সমর্থকরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ও প্রাধান্য দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। অথচ প্রকাশ্যে বুদ্ধ অথবা বৌদ্ধদের বিরোধিতা করার কথা তাঁরা কল্পনা করতে পারেন নি। গোপনে তাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছিলেন। দেবদত্তের মত শত্রুরাও নিশ্চেষ্ট হয়ে বসেছিলেন না। তাছাড়া যখন বহুলোকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ঘটলো তখন মতানৈক্য হওয়া স্বাভাবিক হলো; এবং গৃহী উপাসক ছাড়া যাঁরা সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ সঙ্ঘের নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে মৃদু আপত্তি জানাতে লাগলেন। ক্রমশঃ তাঁদের আপত্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। এইসব কারণে বুদ্ধ ক্রমশঃ নানাপ্রকার সমস্যার সম্মুখীন হতে লাগলেন। আগে অনন্যমনা হয়ে তিনি ধর্ম্মপ্রচারের প্রতি সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, এখন আর তা সম্ভব হলো না।

আর্য্যাবর্ত্তের যে রাজারা তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছিলেন তাঁরা একে একে লোকান্তরিত হয়েছিলেন। শুদ্ধোদন, বিম্বিসার, প্রসেনজিৎ, উদয়ন এঁরা কেউ জীবিত ছিলেন না। যাঁরা তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তাঁরা সকলেই বুদ্ধের প্রতি

অনুরক্ত ছিলেন, একথা বলা যায় না। অজাতশত্রু, বিরুঢ়ক এরা প্রকাশ্যে তাঁর এবং তাঁর মতবাদের বিরোধিতা করতেন। তাঁর নিজেরও বয়স হয়েছে, আগের মত কাজ করার ক্ষমতা আর নেই। মৌদ্‌গল্যায়নের মত উৎসাহী প্রচারকও লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু যে ভাবনা সব চেয়ে বড় দুর্ভাবনা হয়ে তাঁর মনে দেখা দিল, সেটি হচ্ছে সঙ্ঘের অন্তর্বিরোধ।

বুদ্ধের শিষ্যদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে তার দায়িত্বও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল। সঙ্ঘে যাঁরা প্রবেশ করেছিলেন তাঁরা সকলেই বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের অনুশাসন যথাযথ মেনে চলবে এটা আশা করা যেতো না। অনেক সময় ভিক্ষুরা যে সব অনাচার করতেন সে-সব অনাচারের কথা বুদ্ধ শুনতে পেতেন। তাছাড়া নারীরাও সঙ্ঘে প্রবেশ করেছিলেন। বুদ্ধ প্রথমে নারীদের সঙ্ঘে প্রবেশ অনুমোদন করেননি। কিন্তু যখন মাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী অনেক শাক্য-কুলনারীদের সঙ্গে নিয়ে বৈশালীতে এসে সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি চাইলেন তখন আনন্দের কথায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত অনুমতি দিলেন। তারপর থেকে সমাজের সকল স্তর থেকে নারীরা ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগ দিতে লাগলেন। ভিক্ষুণী সঙ্ঘগুলো যাতে যথাযথভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য তিনি কতকগুলি নিয়ম বাধ্যতামূলক করেছিলেন। অনেকের কাছে এ নিয়মগুলো অতিরিক্ত কঠোর বলে মনে হলেও সাধারণ ভিক্ষুণীরা নিয়মগুলোর বিরোধিতা করতেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভিক্ষুণী সঙ্ঘে নানারকম দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল। এইসব কারণে বুদ্ধকে অনেক সময় সঙ্ঘ পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করতে হতো। ভিক্ষু সঙ্ঘে যারা প্রবেশ করতেন তাঁরাও সকলে বুদ্ধের আদর্শ সব সময় পুরোমাত্রায় অনুসরণ করে চলতে পারতেন না। বুদ্ধ ছাড়া তাঁর শিষ্যরাও অনেক সময় অনেককে সঙ্ঘে প্রবেশ করার অনুমতি দিতেন। তাঁরা সকলেই লোকচরিত্র সম্বন্ধে বহুদর্শী অথবা অভ্রান্ত

ছিলেন না। এঁরা অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় লোককে সঙ্ঘে প্রবেশের অনুমতি দিতেন, তার ফলে বৌদ্ধসঙ্ঘে এমন সব লোক প্রবেশ করেছিলেন যাঁরা পুরোমাত্রায় বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম্মের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। এঁরা অনেক সময় তাঁদের চরিত্র এবং কার্য্যের দ্বারা বুদ্ধের আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতেন। এঁদের অনাচারের কাহিনী যখন বুদ্ধের কানে আসতো তখন সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়তেন। তাছাড়া দেবদত্তের নেতৃত্বে একদল তথাকথিত বুদ্ধভক্ত সঙ্ঘে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনের জন্য বুদ্ধ যে মহান ব্রত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর সেই পরিচয় তাঁকে মহামানবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু তিনি সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার প্রতি কখনও নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য দেখাননি। তাঁর মনটি ছিল সহানুভূতিতে ভরপুর। নিজে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হয়েও তিনি সংসারের মানুষের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমার চোখে দেখতেন। যারা সঙ্ঘে প্রবেশ করবে তাদের কাছে থেকে তিনি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা আশা করতেন এবং কেউ যদি সঙ্ঘের বিধান ভঙ্গ করতো তাহলে তার শাস্তিবিধান করতেও তিনি ইতস্ততঃ করতেন না, কিন্তু গৃহী উপাসকদের কাছে তিনি ছিলেন করুণার প্রতিমূর্ত্তি। তিনি যখন যেখানে যেতেন তখন তিনি সেখানকার সাধারণ লোকের সঙ্গে অবাধে মিশতেন। তিনি যে-সব উপদেশ দিতেন তাতে দার্শনিকতত্ত্বের কোনো জটিলতা থাকতো না। সাধারণ লোক যে-ভাবে বল্লে সহজে তাঁর কথা বুঝতে পারে সে-ভাবে তিনি তাঁদের উপদেশ দিতেন। একবার তাঁর এক শিষ্য তাঁর উপদেশগুলোকে সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করার অনুমতি চেয়েছিলেন কিন্তু বুদ্ধ সে অনুমতি দেননি। সাধারণ লোকের কাছে সাধারণ লোকের সহজবোধ্য ভাষায় তিনি তাঁদের উপদেশ দিতেন। তাঁদের শুধু উপদেশই দিতেন তা নয়, তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনের অভাব-অভিযোগ, সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে তিনি তাঁদের

সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করতেন। যখনি অবসর পেতেন তখনি অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের সাংসারিক জীবনের খুঁটীনাটী নিয়ে আলোচনা করতেন।

বুদ্ধ যখন আলবিতে ছিলেন তখন একটি দরিদ্র পল্লীবাসী প্রতিদিন তাঁর উপদেশ শুনতে আসতো। কোনদিন অনুপস্থিত থাকতো না—কিন্তু একদিন তাকে না দেখে বুদ্ধ তার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে রইলেন। অনেকক্ষণ পর সে লোকটি এলো। তার বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে সে বুদ্ধকে বল্লে যে সকালবেলা হঠাৎ তার গরুটি নিখোঁজ হয়ে যায়। সকাল, দুপুর সমস্তক্ষণ সে গরুটি খুঁজতে ব্যস্ত ছিল তাই তার আসতে দেরী হয়েছে। তার সঙ্গে কথা বলে বুদ্ধ আরো জানতে পারলেন যে গরুটাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়েই সে স্নানাহার না করে যেমন ছিল তেমনি ভাবে ছুটে এসেছে। বুদ্ধ তখনি তার স্নানাহারের ব্যবস্থা করে দিলেন।

অনেক সময় বহু নরনারী শোকগ্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে আসতো। তিনি মধুর ব্যবহার আর মধুরতর উপদেশে তাদের শোক তাপ দূর করে দিতেন। এমনি প্রতিদিন অগণিত দর্শনার্থী তাঁর কাছে ভীড় করে আসতো। তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনে ধর্ম্মপ্রবণতা জাগাতেন। কোনো দর্শনার্থীকেই বিফল করতেন না। যারা তাঁর সঙ্গে কথা বলতো তারা প্রত্যেকেই এই ধারণা নিয়েই যেতো যে এঁর মতন পরমাত্মীয় তাদের আর কেউ নেই। ধর্ম্মগুরু হিসেবে বুদ্ধের স্থান কোথায়—তাঁর ধর্ম্মমতের বৈশিষ্ট্য কি এ সব তারা বুঝতে পারতো না, বুঝবার আগ্রহও তাদের ছিল না। তারা শুধু জানতো—এই পরম কারুণিক পুরুষটি তাদের কত আপনার। তারা বুদ্ধকে শ্রদ্ধা যত করতো, ভালবাসতো অনেক বেশী।

বুদ্ধ তাঁর ধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে তিনজন শিষ্যের উপর প্রধানতঃ

নির্ভর করতেন তাঁদের মধ্যে মৌদ্‌গল্যায়নের আগেই মৃত্যু হয়েছিল। এইবার তিনি আনন্দ আর সারিপুত্রের উপর বেশী-মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। এঁরা দু'জন সঙ্ঘের কল্যাণে তাঁদের শক্তি সামর্থ্য অকাতরে নিয়োজিত করেছিলেন, কিন্তু পাঁচ বছর যেতে না যেতে বুদ্ধ সারিপুত্রকে হারালেন। সারিপুত্র মহা জ্ঞানী ছিলেন—আর বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের জন্য তিনি অনবরত দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতেন। বর্ষার সময়ে তিনি বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে থাকতেন। সারিপুত্র ক্রোধকে সম্পূর্ণভাবে জয় করেছিলেন। ক্রোধকে তিনি কতটা জয় করেছেন তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এক ব্রাহ্মণ তাঁকে আঘাত করেছিল—কিন্তু সারিপুত্র সে আঘাত গ্রাহ্য করেননি অথবা এ নিয়ে তিনি কোনো অভিযোগও করেননি। তিনি যখন সংসার ত্যাগ করে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তখন মাতা রূপসারি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কোনোদিনই তাঁর এই ক্রোধের উপশম হয়নি। একবার রাহুলকে নিয়ে সারিপুত্র যখন স্বগ্রাম নালন্দায় গিয়েছিলেন তখন তিনি একদিন মাতার আমন্ত্রণ ক্রমে তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানে সারিপুত্র যখন আহার গ্রহণ করছিলেন তখন রূপসারি ছেলেকে খুব তিরস্কার করছিলেন এবং বুদ্ধদেবকে পর্য্যন্ত রেহাই দেননি। কিন্তু সারিপুত্রের মুখে কোনো বিরাগের চিহ্ন দেখা গেল না, পরম ঔদাসীন্যভরে তিনি আহার সমাপন করলেন। অনেক সময় দেখা যেতো কোনো ব্যক্তি সঙ্ঘে প্রবেশ করার জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে কিন্তু সেই লোকটি যদি কোনো ক্রমে সারিপুত্রের সাক্ষাৎ লাভ করতো তাহলে তার সঙ্ঘে প্রবেশের পথে শেষ পর্য্যন্ত সকল বাধা দূর হয়ে যেতো। একবার এক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি না পেয়ে স্বয়ং বুদ্ধের কাছে আবেদন প্রার্থী হয়েছিল। যখন সঙ্ঘের কোনো ভিক্ষুই এই ব্রাহ্মণের স্বপক্ষে কিছু বল্লে না—তখন বুদ্ধ সারিপুত্রের দিকে

তাকালেন। সারিপুত্র বুদ্ধকে বল্লেন—এই ব্রাহ্মণ একদিন আমাকে একমুষ্টি অন্নদান করেছিলেন। তাঁর কথা শুনে বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্ঘে যোগদানের অনুমতি দিলেন।

মৌদ্‌গল্যায়নের মৃত্যুর পর থেকে সারিপুত্রের কাজের পরিমাণ অনেক বেড়ে গিয়েছিল। দিনরাত অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে ক্রমে তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়লো। প্রথমে কিছুদিন চিকিৎসা করানো হলো, তাতে কিছু কিছু ফল পাওয়া গেলেও তার দেহের আশানুরূপ উন্নতি হলো না। তবু অসুস্থ দেহ নিয়ে সারিপুত্র পূর্ণ উদ্যমে প্রচারকার্য্য চালিয়ে গেলেন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিনি বুঝতে পারলেন এভাবে বেশীদিন চালানো যাবে না। তাঁর জন্মস্থান নালন্দার কথা তাঁর মনে পড়লো। তিনি ভাবলেন শেষ নিঃশ্বাস তিনি জন্মভূমিতেই ত্যাগ করবেন। এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি তাঁর জনকয়েক শিষ্য সহ নালন্দায় এলেন। কোনো গৃহে আতিথ্য গ্রহণ না করে তিনি গ্রামের উপকণ্ঠে একটি গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন।

কিছুদিন পর তাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমন্ত্রণ জানালেন গৃহে বাস করার। প্রথমে সারিপুত্র অনুরোধ রক্ষা করতে সম্মত হননি, কিন্তু যখন শরীরের অবস্থা খারাপ হতে লাগলো তখন তিনি মাতা রূপসারির কাছে সংবাদ পাঠালেন যেন তাঁর জন্য একটি স্বতন্ত্র কক্ষের ব্যবস্থা করা হয়। সংসার ত্যাগ করার পর থেকে রূপসারি ছেলের উপর মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এইবার ছেলে গৃহে ফিরে আসতে চাইছে জেনে তাঁর মনে হলো এতদিনে তাঁর সুবুদ্ধি হয়েছে। তাই খুসী হয়ে তিনি তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু বাড়ী এসেও সারিপুত্রের অবস্থার উন্নতি হলো না, বরং তাঁর মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পেলো। মৃত্যুর পূর্ব্বে সারিপুত্র মাকে ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়ে তাঁর প্রতি মায়ের বিমুখতা দূর করেছিলেন। রূপসারি

এই ভেবে মনে আঘাত পেলেন যে—তাঁর পুত্র যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁকে তিনি উপযুক্ত মর্য্যাদা দেননি।

কোনো ভিক্ষুর মৃত্যু হলে তাঁর ভিক্ষাপাত্র এবং চীবর সঙ্ঘে ফিরিয়ে দিতে হতো। এই নিয়ম অনুসারে সারিপুত্রের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই তাঁর ব্যবহৃত চীবর আর ভিক্ষাপাত্র বুদ্ধের কাছে নিয়ে এলে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সকলেই সারিপুত্রের মৃত্যু হয়েছে জেনে শোকাভিভূত হয়ে পড়লেন। বুদ্ধ শোক-তাপের অতীত ছিলেন—তিনি মুখে শোক প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যে তিনিও বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি শিষ্যদের সঙ্গে সারিপুত্র সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। তিনি বল্লেন—সারিপুত্র মহাজ্ঞানী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। তিনি আত্মসংযমী ছিলেন। তিনি কারো মনে আঘাত দিতেন না। তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকতে চাইতেন। তাঁর সম্বন্ধে সব চেয়ে বড়কথা এই যে তিনি "ধর্ম্মপ্রচারে পৃথিবীর মত ধৈর্য্য, শৃঙ্গহীন বৃষের মত শক্তি দেখাইয়াছেন; তাঁহার মত লোক পৃথিবীতে অল্পই জন্ম-গ্রহণ করে।"

আর্য্যাবর্ত্তের বিভিন্ন রাজ্যের যে সব রাজা বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন অথবা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তাঁরা সকলেই একে একে লোকান্তরিত হয়েছেন। মৌদ্‌গল্যায়ন এবং সারিপুত্রের মত উৎসাহী প্রচারকরাও কর্ম্মক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তারপর দেবদত্তের মত কুচক্রীরা সঙ্ঘে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। সর্ব্বোপরি বুদ্ধের স্বাস্থ্যও অনেকখানি ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি একদিনের জন্যও বিশ্রাম নিতে সম্মত হননি। তিনি যখন যেখানে থাকতেন—সকলকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করে তাঁর মুখ থেকে ধর্ম্মের কথা শুনতে আদেশ করতেন। এই কারণে তাঁর

দর্শনার্থীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে লাগলো। বুদ্ধ সাধ্যমত সকলকে উপদেশ দিতেন।

বুদ্ধ রাজগৃহের অনতিদূরে গৃধ্রকূটে অবস্থান করেছিলেন—এই সময় মগধরাজ অজাতশত্রু তাঁর কাছে অনুচর পাঠিয়ে জানতে চেয়েছিলেন যে বৃজিগণের সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধোদ্যোগ চল্‌ছে তাতে তিনি জয়লাভ করতে পারবেন কিনা। তার উত্তরে বুদ্ধ বলে পাঠিয়েছিলেন যতদিন বৃজিগণ ঐক্যবদ্ধ থাকবে ততদিন পৃথিবীর কোনো শক্তি তাঁদের পরাভূত করতে পারবে না। গৃধ্রকূট থেকে বুদ্ধ পাটলীগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করলেন—তাঁর সঙ্গে চললো তাঁর অগণিত শিষ্যরা। এতকাল পাটলীগ্রাম অবজ্ঞাত অবস্থায় ছিল, কিন্তু অজাতশত্রু এই স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে আরম্ভ করেছিলেন। গঙ্গা ও শোন নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই স্থানটি দেখে বুদ্ধ খুব প্রীতিলাভ করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই স্থানটি ক্রমে একটি বিখ্যাত নগরে পরিণতি লাভ করবে। বুদ্ধের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল এবং এই পাটলীগ্রামই ভবিষ্যতে রাজধানী পাটলীপুত্র রূপে সর্ব্বভারতীয় খ্যাতি অর্জ্জন করেছিল।

কিছুদিন পাটলীগ্রামে অবস্থানের পর বুদ্ধ নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হলেন। এই পশ্চিম তোরণটি পরবর্ত্তী যুগে গৌতমদ্বার নামে পরিচিত হয়েছিল। এর পর বুদ্ধ কোটিগ্রামে গেলেন। তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়ে গ্রামবাসীরা দলে দলে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা জানাতে এলো। তিনি গ্রামের উপকণ্ঠে শিংশপা কুঞ্জে এক বিরাট সভা আহ্বান করে শ্রোতাদের কাছে তাঁর ধর্ম্মমতের মূল নীতি ব্যাখ্যা করে শোনালেন।

কোটিগ্রাম থেকে বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে নাদিকদের গ্রামে এলেন। এই স্থানে আনন্দ তাঁকে কয়েকজন মৃত সহকর্ম্মীর মৃত্যুর পরবর্ত্তী

অবস্থা জানতে চাইলে বুদ্ধ আনন্দের কাছে বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, জীবিত প্রাণী মাত্রেরই মৃত্যু অনিবার্য্য। সুতরাং মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করা কোনো শ্রমণের পক্ষে অনুচিত কাজ। এরপর আনন্দ এ সম্পর্কে আর কোনো কিছু জানবার আগ্রহ প্রকাশ করেননি।

নাদিকদের গ্রাম থেকে শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধ বৈশালীতে উপস্থিত হলেন। বৈশালীর লিচ্ছবীরা তাঁকে সাদর সম্বর্দ্ধনা জানালো। বুদ্ধ প্রথমে আম্রপালীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। বৈশালীর সম্ভ্রান্ত বংশীয় বহু ধনী শ্রেষ্ঠী বুদ্ধকে তাঁদের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন—কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে অম্বপালীর গৃহেই অবস্থান করলেন। পরে তিনি বৈশালীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বেলুব গ্রামে বর্ষা যাপন করলেন। ভিক্ষুরা বৈশালীতেই অবস্থান করতে লাগলেন।

বৈশালীতে অবস্থান করবার কালেই বুদ্ধ উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর দেহের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু তাঁর মনে হলো যে তখনি যদি তাঁর দেহাবসান হয় তাহলে তিনি সকল ভিক্ষুদের একসঙ্গে সভা আহ্বান করে তাঁর শেষ বাণী তাঁদের দিয়ে যেতে পারবেন না, কারণ ভিক্ষুরা তখন ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে ছিলেন। তাই বুদ্ধের মনে হলো যে আরো কিছুদিন তাঁর দেহধারণ করতেই হবে—তাই তিনি মনের সবটুকু শক্তি সংগ্রহ করে ব্যাধির প্রকোপ দমন করার চেষ্টা করলেন। তাঁর শিষ্যদের এমন কি বিশ্বস্ত অনুচর আনন্দকেও এ সম্বন্ধে তিনি কোনো কথা জানতে দিলেন না। ক্রমে তাঁর মনের কাছে দেহের পরাজয় ঘটলো, সাময়িকভাবে তিনি ব্যাধির হাত থেকে মুক্তি পেলেন। আর বেশীদিন তাঁর আয়ু অবশিষ্ট নেই—এই ভেবে বুদ্ধ দ্বিগুণতর উৎসাহ নিয়ে শিষ্য এবং অন্যান্যদের কাছে তাঁর মতবাদ প্রচার করতে লাগলেন।

কিন্তু বুদ্ধ যত উৎসাহ নিয়েই তাঁর ধর্ম্মপ্রচার করতে থাকুন না কেন, আনন্দ তাঁর স্বাস্থ্যহানি দেখে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর শঙ্কার কথা অকপটে বুদ্ধের কাছে নিবেদন করলেন। তিনি জানালেন যে সঙ্ঘ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভ উচিত হবে না। তাঁর উত্তরে বুদ্ধ বলেছিলেন, "সঙ্ঘ আমার কাছে কি আশা করে? আমার যা বক্তব্য ছিল, আমি দীর্ঘকালধরে অকপটে সকলের কাছে তা প্রকাশ করেছি।...আনন্দ, আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, এখন আমার বয়স আশী বছর! পুরাতন জীর্ণ শকটের মত আমাকে অনেক চেষ্টায় শরীর রক্ষা করতে হচ্ছে। এখন মাত্র অনন্যচিত্ত ধ্যানের অবস্থাতে আমি সুস্থ বোধ করি। অতএব আনন্দ এখন তোমরা নিজেরাই নিজেদের দীপ হইয়া, নিজেদের শরণ লইয়া বিহার কর।"

অসুস্থ শরীর নিয়েও বুদ্ধ প্রতিদিন বৈশালীতে ভিক্ষাপাত্র হাতে বার হতেন। যেদিন বৈশালী ছেড়ে যাবেন সেদিন ভিক্ষা করে ফেরার সঙ্গে তিনি অনেকক্ষণ ধরে বৈশালীর ঘরবাড়ী রাজপথ গাছপালা অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখলেন। আনন্দ তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সেদিন তাঁর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হয়েছিল এতো সংসার-বিরাগী পুরুষের নির্লিপ্ত দৃষ্টি নয়। হয়তো অবচেতন মনে তাঁর মনে হয়েছিল যে এই শেষবারের মত বৈশালীকে দেখা।

বৈশালী ছেড়ে বুদ্ধ এলেন বৃজিদের রাজ্যে। সেইখানে বেলুব গ্রামের অনতিদূরে একটি শিংশপা কুঞ্জে তিনি কিছুদিন বাস করলেন। এই সময় বৈশালী রাজ্যে ছুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং খাদ্যাভাব সইতে না পেরে অনেক ভিক্ষু বৈশালী ছেড়ে বৃজি রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বেলুব বনে থাকার সময়ে বুদ্ধের শরীরের কোনও উন্নতি দেখা গেল না বরং বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহে পীড়ার লক্ষণ প্রকাশ পেলো। কিছুদিনের মধ্যে সে পীড়ার প্রকোপ কমে গেলে বুদ্ধ পাবা গ্রামে এলেন। এইখানে

চুন্দ নামে এক কর্ম্মকারের একটি আম বাগান ছিল—বুদ্ধ এই আম বাগানে অবস্থান করতে লাগলেন। বুদ্ধ যেদিন পাবাতে এলেন সেদিনই তাঁর সঙ্গে যে সব শিষ্য ছিলেন তাঁদের ডেকে সবাইকে একসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে ধর্ম্ম-উপদেশ দিলেন। সভা শেষ হয়ে যাবার পর চুন্দ তাকে তাঁর গৃহে আহার গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন। বুদ্ধ সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। আহারের সময় বুদ্ধ যখন ভোজনকক্ষে উপস্থিত হলেন তখন তাঁরই এক অনুচর বুদ্ধের জন্য যে আহারের পাত্রটি বিশেষভাবে মনোনীত করা হয়েছিল সে পাত্রটি সে নিজে অন্যের অলক্ষ্যে গ্রহণ করলো। শিষ্যটি ভেবেছিল যে এই পাত্র সরিয়ে নেওয়ার বিষয় কেউ লক্ষ্য করেনি, কিন্তু বুদ্ধ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন যদিও তিনি মুখে কোনো কথা বলেননি। যাই হোক, চুন্দ তার জন্য দ্বিতীয় একটি আহার্য্যের পাত্র নিয়ে এলো। অনেক চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব ভালো আহার্য্য প্রস্তুত করা যায় চুন্দ তাই করেছিল। আহার্য্য পরিবেশন করা মাত্র বুদ্ধ গৃহস্বামীকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "চুন্দ, তুমি আহার্য্যের জন্য যে শূকর মাংসের আয়োজন করেছ, সে মাংস তুমি আমাকেই পরিবেশন করো, অন্য ভিক্ষুকে এই মাংস দিও না।" তিনি আরো বল্লেন, "মনুষ্য লোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকে বুদ্ধ ভিন্ন অন্য কেউ নেই যিনি শূকরমাংস গ্রহণ করে তা জীর্ণ করতে পারেন। আমাকে পরিবেশন করার পর যে মাংস অবশিষ্ট থাকবে তা গর্তের মধ্যে নিক্ষেপ করো।"

চুন্দ তাঁর কথামত বুদ্ধকে মাংস পরিবেশন করে বাকী সবটুকু মাংস গর্তে ঢেলে দিল। কিন্তু আহার গ্রহণের কিছু পরেই বুদ্ধ শারীরিক অস্বস্তি বোধ করলেন। তিনি রক্ত আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন। রক্তপাত ও যন্ত্রণা বোধ হেতু তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়লেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পাবা ছেড়ে পায়ে হেঁটে কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর যন্ত্রণা ক্রমশঃ বেড়ে

চললো। শেষে এক জায়গায় এসে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পথের ধারে একটি গাছের তলায় বসে পড়লেন। তাঁর কথামত আনন্দ সেখানে একটি চীবর চার ভাঁজ করে বিছিয়ে দিলেন। বুদ্ধ বিশ্রাম নিতে লাগলেন। কিন্তু যন্ত্রণার বিশেষ কোনো উপশম হলো না। একটু পরেই তিনি দারুণ তৃষ্ণা বোধ করলেন। আনন্দর কাছে তিনি পিপাসা নিবারণের জন্য জল চাইলেন। কাছেই ছিল ককুস্তন নদী। আনন্দ ভিক্ষাপাত্র হাতে ছুটে গেলেন, কিন্তু গিয়ে দেখলেন খানিক আগে পাঁচশত শকট সে নদী পার হয়ে গেছে, সেইজন্য নদীর জল ঘোলাটে। সে জল পান করার অযোগ্য। কিন্তু তা হলেও ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ করে আনন্দ বুদ্ধের কাছে ফিরে এলেন। পিপাসার্ত্ত বুদ্ধ সেই জলপাত্র দেখে আগ্রহে হাত বাড়ালেন। আনন্দ তাঁকে বললেন, "ভগবন, এই জল দিয়ে আপনি মুখ প্রক্ষালন করুন; এজল পানের অযোগ্য। হিরণ্যবতী নদী এখান থেকে খুব দূরে নয়, আমি সেইখান থেকে পানযোগ্য জল এখনি নিয়ে আসছি।"

আনন্দের কথামত বুদ্ধ সেই জল দিয়ে হাত, পা, মুখ ধুয়ে নিলেন, তারপর তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং কিছুক্ষণ পরেই ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলেন—তাঁর বাহ্য সংজ্ঞা লোপ পেলো। এইসময় পুক্‌কুস নামে মল্ল বংশীয় এক ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন—তিনি পথের পাশে গাছের তলায় বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখে বিস্মিত হলেন; আর অগ্রসর না হয়ে তিনি সেই গাছের তলায় এসে কখন বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ হবে সেই আশায় অপেক্ষা করে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে বুদ্ধের ধ্যান ভঙ্গ হলো। তিনি আগন্তুকের পরিচয় জানতে চাইলেন। পুক্‌কুস আলার কালামের শিষ্য জেনে বুদ্ধ প্রীত হলেন। কথায় কথায় পুক্‌কুস তাঁকে জানালেন যে, একবার তাঁর গুরু একটি উন্মুক্ত স্থানে ধ্যানে বসেছিলেন এবং যে স্থানে তিনি ধ্যান নিবিষ্ট ছিলেন, সেই স্থানের

খুব কাছে দিয়ে অনেক গাড়ীঘোড়া গেলেও তাঁর ধ্যানের কোনো ব্যাঘাত হয়নি। বুদ্ধদেব পুক্কুসকে জানালেন যে তাঁরও অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তিনি একবার কোনো একটি মুক্ত স্থানে ধ্যান নিবিষ্ট হয়ে বসেছিলেন। কতক্ষণ তিনি ধ্যানমগ্ন ছিলেন তাঁর মনে নেই, কিন্তু যখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হলো তখন তিনি দেখতে পেলেন যে তাঁর আশেপাশে বহুলোক জড় হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের মুখে উত্তেজনা ও বিস্ময়ের চিহ্ন। তিনি তাঁদের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে এখানে অনেকক্ষণ ধরে মেঘগর্জ্জন ও বৃষ্টিপাত হয়ে গিয়েছে এবং বজ্রাহত হয়ে দু'টি চাষী এবং চারটি বলদ মারা গেছে। কিন্তু এইসব কাণ্ড সত্ত্বেও তাঁর ধ্যানের কোনো ব্যাঘাত হয়নি।

বুদ্ধের কথা শুনে পুক্কুস তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। সোনালি রংএর একটা কাপড় এনে তিনি বুদ্ধকে দান করলেন। পুক্কুসের কাজ থাকার জন্য তিনি তাঁর গন্তব্যস্থানে চলে গেলেন।

একটু পরে আনন্দ ফিরে এলেন—বুদ্ধ তাকে পুক্কুসের দেওয়া কাপড়খানা দিয়ে বল্লেন ঃ এই কাপড়ের আঁচল কেটে নিয়ে আমায় দাও, আমি পরবো।

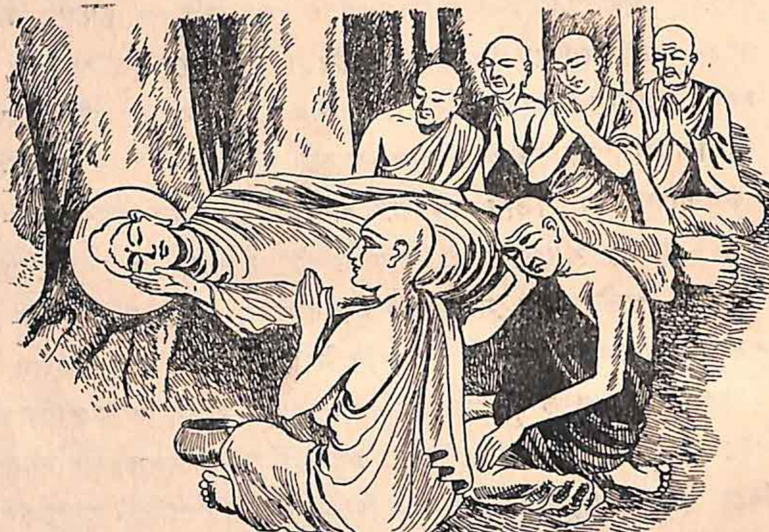
আনন্দ তাঁর কথামত কাজ করলেন। বুদ্ধ যখন নতুন কাপড়খানা পরে বসলেন তখন তাঁর এক নতুন রূপ আনন্দের চোখে পড়লো। আনন্দ নিজের মনের ভাব গোপন করতে পারলেন না। তিনি বল্লেন, আমি ত্রিশ বছর আপনার সান্নিধ্যে রয়েছি—কিন্তু আপনাকে আজ যত জ্যোতির্ম্ময় দেখাচ্ছে, আগে আমি কখনও এমন দেখিনি। আনন্দের কথা শুনে বুদ্ধ একটু হাসলেন মাত্র, কোনো কথা বল্লেন না।

একটু পরে বুদ্ধ অনেকটা সুস্থ বোধ করলে সকলে মিলে হিরণ্যবতী নদীর দিকে এগিয়ে গেলেন। এখানে বুদ্ধ নদীর জলে স্নান করলেন। তারপর নদী পার হয়ে তীরবর্ত্তী এক আমবাগানে

বিশ্রাম নিলেন। তারপর আনন্দকে ডেকে বল্লেন ঃ চুন্দর বাড়ীতে আহার করে আমার অসুখ হয়েছে একথা জানতে পারলে অনেকেই চুন্দর উপর অসন্তুষ্ট হবে ; আমার শরীরের জন্য চুন্দকে যেন কেউ দায়ী না করে। আরো কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর বুদ্ধ অরণ্যপথে কুশী-নগরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। অসমতল পথ, দু'ধারে বন, তারই মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা। তাই ধরে বুদ্ধ আর তাঁর সঙ্গীরা এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু কিছু পথ অতিক্রম করে কুশীনগরের কাছাকাছি গিয়ে বুদ্ধ আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর এগোনো সম্ভব হলো না। তিনি আনন্দকে শয্যা প্রস্তুত করে দিতে বল্লেন। দু'টা প্রকাণ্ড শালগাছের মাঝে একটা জায়গা আনন্দ বেছে নিলেন ; গভীর যত্নে সেইখানেই বুদ্ধের শয্যা রচনা করা হলো। শয্যায় শয়ন করার একটু পরেই তিনি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন।

আনন্দ অপলক দৃষ্টিতে সেই রোগ পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দীর্ঘ ত্রিশ বছর তিনি একাগ্রচিত্তে নিরলস অধ্যবসায় নিয়ে এই মহাপুরুষের সেবা করেছেন। তাঁর প্রতিটি অঙ্গক্ষেপ ও ভঙ্গীর সঙ্গে আনন্দের নিবিড় পরিচয়। কিন্তু আজ তিনি বুদ্ধের দিকে যতক্ষণ তাকিয়েছিলেন, বার বার তার মনে হচ্ছিল এই দুর্ব্বল দেহ, এই মুক্ত পুরুষটিকে আর ধরে রাখতে পারবে না, বিদায় মুহূর্ত্ত সমাগত প্রায়। এই চিন্তায় আনন্দ এত অধীর হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি আর সেখানে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি বুদ্ধকে ঘুমন্ত দেখে অদূরে গিয়ে অশ্রুপাত করতে লাগলেন। খানিক পরে বুদ্ধের নিদ্রাভঙ্গ হলো। আনন্দকে শয্যাপার্শ্বে দেখতে না পেয়ে তিনি তাঁর এক অনুচরকে দিয়ে আনন্দকে ডেকে পাঠালেন। চোখের জল ফেলতে ফেলতে আনন্দ এলেন। আনন্দর পিছন পিছন অন্যান্য শিষ্যরাও সেখানে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাদের লক্ষ্য করে শোক পরিহার করতে বল্লেন। আনন্দ তখন বুদ্ধকে বল্লেন ঃ শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, সাকেত, বারাণসী, চম্পা, বৈশালী এইসব সমৃদ্ধ জনাকীর্ণ

মহানগরীতে আপনার শরণাগত নরনারীর অভাব নেই। এই-সব নগরের যে কোনো একটিতে দেহলীলা সংবরণ না করে কুশীনগরের ন্যায় অখ্যাত অজ্ঞাত স্থানটিকে আপনি কি কারণে নির্ব্বাচিত করলেন ? এই কথার উত্তরে বুদ্ধ বল্লেন ঃ এই কুশীনগরে



মহাসুদর্শন নামে এক পরম ধার্ম্মিক ও পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজধানী কুশাবতী। সুতরাং এই জায়গাটি মোটেই অখ্যাত স্থান নয়। এই সময় উপবান নামে এক স্থবির বুদ্ধের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে ইঙ্গিতে একটু দূরে সরে দাঁড়াতে বল্লেন।

বুদ্ধ যখন অন্তিম শয্যায় শয়ান, শিষ্যরা গভীর উদ্বেগ আর হতাশা নিয়ে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন—এমন সময় আনন্দর কাছে সংবাদ এলো সুভদ্র নামে এক পরিব্রাজক বুদ্ধের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। বুদ্ধের যন্ত্রণাকাতর দেহের দিকে তাকিয়ে আনন্দ এসময় কোনো সাক্ষাৎপ্রার্থীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হোক তা চাননি—কিন্তু বুদ্ধ তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে ইঙ্গিতে জানালেন

যেন সুভদ্রকে সেখানে নিয়ে আসা হয়। সুভদ্র এলেন। বয়সে বুদ্ধের চেয়ে ইনি অনেক বড়। দীর্ঘকাল ধরে ইনি নানাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। সৎপথে জীবন যাপন করেছেন, কিন্তু তবু তাঁর মনের সব প্রশ্নের তিনি সমাধান পাননি। তাই তিনি আজ বুদ্ধদর্শনে এসেছেন। বুদ্ধের তখন যে অপরিসীম শারীরিক ক্লেশ হচ্ছিল তাতে শিষ্যরা মনে করেছিলেন যে বুদ্ধ কোনো আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন না, কিন্তু তিনি সকলকে বিস্মিত করে পরম ধৈর্য্যভরে বহুক্ষণ ধরে সুভদ্রের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। সুভদ্র তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এইবার সুভদ্র বুদ্ধের কাছে অনুমতি চাইলেন —যেন তিনি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করতে পারেন। বয়সে তিনি বুদ্ধের অনেক বড়। বুদ্ধের দেহত্যাগ তাঁর চোখের সামনে ঘটবে এ তিনি সহ্য করতে পারবেন না। বুদ্ধ সম্মতি দিলে শিষ্যদের সম্মুখে সুভদ্র ধ্যানমগ্ন হলেন আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি নির্ব্বাণ লাভ করলেন। সুভদ্রের এই সৌভাগ্য দেখে শিষ্যরা যখন নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছিলেন—তখন বুদ্ধ তাঁদের কাছে ডেকে একটি কাহিনী শোনালেন ঃ

অনেক বছর আগে একটা পাহাড় ঘেরা বনে একদল হরিণ থাকতো। তাদের সংখ্যা একহাজার। তারা নিজেদের মধ্যে একজনকে যূথপতি বলে মেনে নিয়েছিল। সব সময় তারা তারই নির্দ্দেশে চালিত হতো, আর মনের সুখে ঘুরে ফিরে বেড়াতো। একদিন সেই বনে এক শিকারী এলো। হরিণের দল দেখে হরিণ শিকার করতে আসবে ঠিক করে সে রাজার কাছে খবর দিতে গেল। শিকারীর হাবভাব দেখে যূথপতি চিন্তিত হয়ে পড়লো, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করার আগেই শিকারীরা এসে চারধার থেকে তাদের ঘিরে ফেল্লে। যূথপতি যখন দেখলে যে ওখান থেকে তখনি অন্যস্থানে আশ্রয় নিতে না পারলে সমস্ত হরিণগুলোই মারা পড়বে তখন সে চারদিক খুঁজে দেখতে পেলো যে একটু দূরে একটা

পার্ব্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীটি চওড়া খুব বেশী নয়, কিন্তু তাতে খর স্রোত। যূথপতির মনে হলো যদি কোনো রকমে তারা ঐ নদীটি পার হতে পারে, তাহলে তাদের জীবনের কোনো ভয় নেই। তার কথামত হরিণের দল সেই নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হলো। কিন্তু নদীর স্রোত দেখে কেউ তাতে নামতে সাহসী হলো না। নদীটি অপরিসর হলেও সেটি লাফ দিয়ে উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব ছিল না—অথচ সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়; তাই যূথপতি নিজেই সেই স্রোতের মধ্যে নেমে গেল আর তার সঙ্গীরা কথা মত তার পিঠে পড়ে লাফিয়ে নদী পার হতে লাগলো। তাদের পায়ের ক্ষুর লেগে যূথপতির চামড়া কেটে রক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। কিন্তু দেহের কষ্ট একটুও গ্রাহ্য না করে যূথপতি নদীর জলে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। তারপর যখন তার মনে হলো দলের সবাই পার হয়ে গেছে তখন সে পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলো যে একটা ছোট্ট হরিণ-শিশু অসহায় ভাবে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। যূথপতির পিঠে পা রেখে নদী পার হবে সে ক্ষমতা তার নেই। ওকে দেখে যূথপতির ভারী মমতা হলো—তাই নদী থেকে উঠে গিয়ে তাকে পিঠে করে নিরাপদে নদীর অপর পারে পৌঁছে দিল। তার মুখে একটা অপরিসীম তৃপ্তির রেখা ফুটে উঠলো। তার দলের প্রত্যেকটি হরিণকে সে রক্ষা করতে পেরেছিল কিন্তু নিজেকে সে রক্ষা করতে পারলো না। সমস্ত পিঠটা তার ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে, আর ক্ষতস্থান থেকে অঝোর ধারায় রক্ত ঝরে পড়ছে। দাঁড়াবার শক্তি পর্য্যন্ত অবশিষ্ট নেই। জল থেকে উঠে নদীর ধারে একটা পাথরের উপর মাথা রেখে সে শুয়ে পড়লো—এই তার শেষ শোয়া। মুহূর্ত্তের মধ্যে তার দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেল।—এই কাহিনীটি শেষ করে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বল্লেন, এই গল্পটি আমার পূর্ব্ব জন্মের; যূথপতি ছিলাম আমি আর এই হরিণ শিশুটি ছিল সুভদ্র। সুভদ্রকে যে আমি শিষ্য করে নিয়েছি

আর তার কথামত তাকে নির্ব্বাণ লাভের সুযোগ দিয়েছি—সেটা তার পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফল।

কঠিন ব্যাধিতে বুদ্ধ আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাঁর অন্তিম মুহূর্ত্ত আগতপ্রায়—এই সংবাদ পেয়ে মল্ল বংশীয়রা দলে দলে তাঁকে দর্শন করতে এলো। সবাইকে একসঙ্গে তাঁর শয্যার পাশে নিয়ে গেলে বুদ্ধের শান্তির ব্যাঘাত হতে পারে মনে করে আনন্দ এক একটি পারিবারকে এক একবারে নিয়ে বুদ্ধ দর্শন করালেন। মল্লরা চলে যাবার পর বুদ্ধ আনন্দের সঙ্গে সঙ্ঘের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করলেন। তাঁকে সম্বোধন করে বুদ্ধ বল্লেন, "আমার মৃত্যুর পর আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মই তোমাদের পরিচালক হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নবীন ভিক্ষুদের নাম বা গোত্র উচ্চারণ করে আহ্বান করবেন। নবীন ভিক্ষুরা প্রবীণ ভিক্ষুদের মাননীয় বা পূজনীয় বলে অভ্যর্থনা করবেন।" তারপর বুদ্ধ শিষ্যদের একসঙ্গে আহ্বান করে বল্লেন, "হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের কারো আমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা মতভেদ থাকে তাহলে আমায় জিজ্ঞাসা কর।" ভিক্ষুরা নিরুত্তর হয়ে রইলেন। তারপর তাদের পক্ষ থেকে আনন্দ বল্লেন, "ভগবন! আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কোনো বিষয়ে আমাদের কোনো মতভেদ নাই।" এরপর বুদ্ধ কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। শিষ্যরাও সেই শান্ত পরিবেশের উপযোগী গাম্ভীর্য্য বজায় রেখে একটু দূর থেকে তাঁদের প্রিয় সঙ্ঘনেতার অন্তিম মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বুদ্ধ নিমীলিত চক্ষে চেয়ে রইলেন। একটু পরে বুদ্ধ চোখ মেলে তাকালেন—অনুচ্চস্বরে তার কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এলো দুটি কথা—"চিত্রম্ জম্বুদ্বীপম্ মনোরমম্ জীবিত মনুষ্যানাম্"—অর্থাৎ এই ভারতবর্ষ বিচিত্র, এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা মনোরম। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে যিনি সংসারের সর্ব্ব বন্ধন মুক্ত হয়েছিলেন, সম্যক্ বোধিতে যাঁর সমস্ত অন্তর আলোকিত

হয়েছিল, নির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে উচ্চারিত এই কথাক'টিতে স্বদেশ ও বিশ্বমানবের প্রতি তাঁর অসীম মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে। শিষ্যরা বুঝতে পারলো যে তথাগতের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হতে আর বিলম্ব নেই। বুদ্ধ ইঙ্গিতে আনন্দকে কাছে ডেকে বল্লেন, "আনন্দ, কেঁদো না, হতাশ হয়ো না, মানুষ যা কিছু ভালবাসুক না কেন, তা তাকে ছেড়ে যেতেই হবে।" এই কথাই বুদ্ধের শেষ বাণী।

এর পর বুদ্ধ ধ্যান মগ্ন হলেন। তাঁর সমস্ত শরীর নিস্পন্দ হয়ে গেল। দেখে মনে হচ্ছিল শ্বাস প্রশ্বাসও নিরুদ্ধ হয়ে এসেছে। তাঁকে এই অবস্থায় দেখে আনন্দ স্থবির অনিরুদ্ধকে বল্লেন, "ভগবান নির্ব্বাণ লাভ করেছেন!" অনিরুদ্ধ বল্লেন, "না আনন্দ, ভগবান নির্ব্বাণ লাভ করেননি। যে অবস্থায় চেতনা ও বেদনার অন্ত হয় তিনি সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছেন।" এরপর বুদ্ধ আরো কিছুক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকলেন—রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হতে লাগলো। রাত্রির তৃতীয় যামে যখন সমস্ত জগৎ মুক্তির কোলে এলিয়ে পড়েছে, তখন মহামানব বুদ্ধ তাঁর নশ্বর দেহের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করলেন। সেদিন বৈশাখী পূর্ণিমা। আশী বছর আগে এমনি এক বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে যাঁর শুভ জন্মমুহূর্ত্ত সূচিত হয়েছিল,—আর একটি বৈশাখী পূর্ণিমা তাঁর জীবনে ছেদ টেনে দিল।

বুদ্ধের নির্ব্বাণ লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষুরা ভূমিতলে লুটিয়ে আকুল হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। এঁরা শোকতাপের অতীত হলেও সেদিনকার সেই মুহূর্ত্তে তাঁরা আত্মসংযম হারিয়ে ফেললেন। দু'চারজন প্রবীণ স্থবির ছাড়া সেদিন আর সকলের চোখেই অবিরল ধারায় জল ঝরতে দেখা গিয়েছিল। অনিরুদ্ধ আনন্দকে বল্লেন, "কুশীনগরে প্রবেশ করে মল্লদের জানাবার ব্যবস্থা করো যে ভগবান পরিনির্ব্বাণ লাভ করেছেন।" আনন্দ

নিজেই কুশীনগরে গেলেন। তাঁর কাছে এই নিদারুণ সংবাদ শুনে মল্লরা যে যেখানে যেরকম ভাবে ছিল সবাই ছুটে এলো শালকুঞ্জে যেখানে তথাগত তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। সাতদিন ধরে তারা সেখানে নৃত্য গীত বাদ্য পুষ্পমাল্য ও গন্ধদ্রব্য দিয়ে বুদ্ধের দেহের পূজা করলো। তারপর সাতদিনের দিন বুদ্ধের দেহ মুকুটবন্ধন নামে চৈত্যে স্থানান্তরিত করা হলো—সেখানে যথাক্রমে পাঁচশত বস্ত্র দিয়ে তাঁর দেহ আচ্ছাদিত করা হলো, তারপর তৈলপূর্ণ লৌহপাত্রে ঐ দেহ রক্ষা করা হলো। সর্ব্বগন্ধময় চিতা প্রস্তুত করা হলো, কিন্তু বুদ্ধের অন্যতম প্রিয় শিষ্য মহাকাশ্যপ তখনও পাবা থেকে এসে পৌঁছেননি বলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্থগিত রাখা হলো। যথাসময়ে পাঁচশত ভিক্ষু সঙ্গে করে মহাকাশ্যপ এসে পৌঁছলেন। তিনি মুকুটবন্ধন চৈত্যে উপস্থিত হয়ে তিনবার চিতা প্রদক্ষিণ করে বুদ্ধের পাদবন্দনা করলেন। তারপর তাঁর দেহে অগ্নি সংযোগ করা হলো, দেখতে দেখতে অস্থি ছাড়া তাঁর দেহের সবটুকুই ভস্মীভূত হয়ে গেল।

সেই সময় রাজা অজাতশত্রুর এক প্রতিনিধি এসে বুদ্ধের দেহাবশেষের অংশ দাবী করলেন।

মগধরাজ বলে পাঠালেন, "ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও তাঁর দেহাস্থির এক অংশ পেতে পারি। আমি তাঁর পবিত্র দেহাস্থির উপর মহাস্তূপ নির্ম্মাণ করবো।" বৈশালী নগরের লিচ্ছবিরাও বুদ্ধের দেহাস্থির অংশ দাবী করলো। তারপর কপিলবাস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগ্রামের কোলিয়গণ, বেঠদীপের একজন ব্রাহ্মণ এবং পাবা গ্রামের মল্লরাও দেহের অংশ দাবী করলো। কিন্তু কুশীনগরের মল্লরা দেহাবশেষের অংশ কাউকে দিতে রাজী হলো না। তারা বল্লে, যেহেতু বুদ্ধ তাঁদের নগরেই দেহত্যাগ করেছেন সুতরাং তাঁরাই দেহাস্থি পাবার একমাত্র অধিকারী। দেখতে দেখতে বিভিন্ন দাবীদারদের মধ্যে ভয়ানক

গোলমাল বেধে গেল—শেষ পর্য্যন্ত দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণ সকলকে ডেকে বল্লেন, "ভগবান বুদ্ধ শান্তিকামী ছিলেন, সেই সাধু পুরুষের দেহাবশেষ নিয়ে আমাদের বিবাদ করা অত্যন্ত অশোভন। আপনারা সকলে একমত হোন, আমরা তাঁর দেহাবশেষকে আটটি সমানভাগে ভাগ করে নিই।" দ্রোণের প্রস্তাব সকলে অনুমোদন না করলেও বুদ্ধের দেহাস্থি আটটি ভাগে ভাগ করা হলো। সকলেই এক এক ভাগ নিয়ে নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে মহাসমারোহে দেহাবশেষের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করলেন। সকলে চলে যাবার পর পিপ্পলীবনের মোরিয়গণ ঐ অস্থির জন্য কুশীনগরে এলেন, কিন্তু যখন তাঁরা দেখলেন যে দেহাবশেষের আর কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই তখন তাঁরা চিতাভস্ম নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করে গেছেন। তিনি ছিলেন মহাপুরুষ। আমাদের শাস্ত্রে আছে মহাপুরুষের মৃত্যু হয় না, তাই বুদ্ধ অমর হয়ে আছেন কোটি কোটি মানুষের মনে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, ভারতবর্ষের বাইরে শ্যাম, কম্বুজ, সুবর্ণভূমি, সিংহল, চীন, তিব্বত, মিশর, জাপান, সিরিয়া, মধ্যএশিয়া, এপিরাস, করিন্থ, ম্যাসিডন প্রভৃতি দেশেও কোটি কোটি নরনারী বুদ্ধের শরণাগত হয়ে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছিলেন—আজও পৃথিবীর দেশ দেশান্তরে অগণিত নরনারীর কণ্ঠে গভীর শ্রদ্ধায় উচ্চারিত হয়—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

মানুষকে শোকতাপ, জরা, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য থেকে মুক্তি দেবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একদিন রাজৈশ্বর্য্য, আত্মীয়-পরিজন, স্ত্রীপুত্র, ভোগ-বিলাস সব কিছু তুচ্ছ করে তিনি যে সত্যের সন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন, তারপর দীর্ঘকাল ধরে কৃচ্ছ্র সাধন ও তপস্যা করে তিনি সেই সত্যের সন্ধান পেলেন। বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি তাঁর উপলব্ধ সত্য পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরলেন সহজ সরল

কথায়। তাঁর উপদেশে কোনো দার্শনিক জটিলতা ছিল না। সহজ কথ্যভাষায় যখন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তিনি সকলের কাছে তাঁর উপদেশ প্রচার করতেন তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর কথা শ্রোতাদের অন্তর স্পর্শ করতো। তিনি বলতেন ঃ অহিংসা পরম ধর্ম্ম। তিনি শেখাতেন ঃ বাসনা নিবৃত্তি হলে মানুষ জীবন ধারণের কষ্ট থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। তিনি বলতেন ঃ "সংসারে যারা বৈরী, তাদের মধ্যে বৈরহীন হয়ে আমরা সুখে জীবন যাপন করবো। যারা বিদ্বেষভাবাপন্ন তাদের মধ্যে আমরা বিদ্বেষ-বর্জ্জিত হয়ে বিচরণ করবো। আসক্তিপরায়ণ মানুষদের মধ্যে আমরা অনাসক্ত হৃদয়ে জীবনের দুস্তর পথ অতিক্রম করবো।" শুধু তাঁর শিষ্যদের জন্য নয়, সকলকেই তিনি ডেকে বলতেন ঃ

'পানং ন হানে' অর্থাৎ প্রাণীকে হত্যা করিও না। 'ন চ দিন্নমা দিয়ে' অর্থাৎ যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ করবে না। 'মুসা ন ভাসে' অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলবে না। 'ন চ মজ্জ পোসিয়া' অর্থাৎ মদ্যপান করবে না। তিনি আরো বলতেন ঃ 'অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে। জিনে কদারিয়ং দানেন সচ্চেন অলীক-বাদিনম্' অর্থাৎ ক্রোধকে অক্রোধের দ্বারা জয় করবে, অসাধুকে সাধুতার দ্বারা জয় করবে, কৃপণকে দান দ্বারা জয় করবে এবং মিথ্যাবাদীকে সত্য দ্বারা জয় করবে। সব মিলিয়ে—

আত্ম দীপো ভব।

"কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র
বুদ্ধের শরণ লইলাম।"

---

20 20
6 [illegible]
120 [illegible]
8 = 60 [illegible]
128 = 60 [illegible]

192 = 90
138 = 60
054 · 30

Ranjeet Banerjee. Debu
Bharti Mondal: [illegible]